রূপরুচি

শ্রীঅসিতকুমার হালদার



জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৫৪
মূল্য দুই টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পরম পূজনীয়

শিল্পগুরু

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে

প্রণাম ক'রে

শ্রীমান চিত্রা, মাসোজি, বীরেন দেববর্ম্মা, রমেন চক্রবর্ত্তী,

মণি গুপ্ত, মকুল দে, অর্দ্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

ছাত্রদের হাতে দিলাম

শিল্পীর অভিনন্দন

শিল্পীদের নিয়ত অভিনন্দন করচে এই তরুপল্লবঘন সবুজ ধরণী, হরিণ-নয়নার ছলছল করুণ কটাক্ষ, অশ্রুহাসি আলো আঁধারের লীলায়, জীবন মরণের ধীর চঞ্চল দোলায়। শিল্পী যখন ভোরের বেলায় চোখ মেলে গবাক্ষের বাহিরে তাকান তখন দেখেন আকাশের পটের উপর আলোর বিচিত্র রেখার আর রঙের ঢেউ রচনা করতে করতে রবি তাঁকে প্রভাতী সুরে আলোর ঝংকারে আহ্বান করচেন, আর বলচেন -"চোখে দেখিস্ প্রাণে কানা হিয়ার মাঝে দেখনা ধ'রে ভুবনখান"। এই আহ্বানে—এই অভিনন্দনে নন্দিত হয়ে, খুসী হয়ে সুরে, রঙে, রেখায়, লিপিতে, শিল্পী আপনার হৃদয়ের অভিবাদন যুগে যুগে সুধীসমাজে বিতরণ করচেন।

প্রকৃতির এই অভিনন্দন রূপকারেরা আপন আপন রসবোধের দ্বারা যে রূপে গ্রহণ করেন সেই রূপ তাঁর রেখায় ও রঙে, সুরে ও গানে, তালে ও ছন্দে ফুটিয়ে তোলেন। কারু কাছে প্রকৃতি নগ্নভাবে দেখা দেয়, কেউ বা তার অপূর্ব্ব বর্ণ-কিরণ-গন্ধময় উজ্জ্বলভাবে তাকে অনুভব করেন। কারু কাছে তার আহ্বান ক্ষীণ হয়ে মৃদু হয়ে মধুর হয়ে বাজে, কারু কাছে সেটা বজ্র হয়ে ভীষণ হয়ে প্রকাশ পায়। নব নব রসে নব নব রূপে শিল্পীরা কেউ কেউ তার সঠিক নগ্নরূপ ধরবার জন্য নানান বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোছায়ার ওজন ও হিসাবের অঙ্ক কসচেন, আবার কোন কোন আপনভোলা শিল্পী অবহেলায় তুলির অল্প একটু আঁচড়ে তার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিটি ফুটিয়ে তুলচেন। তার মানে এই যে কারু কাছে তার অভিনন্দন না পৌঁছেই তার রূপটি ধাঁধা লাগিয়েছে আর অপরের কাছে তার অভিনন্দন ভাবলোকের শ্রী রূপে

প্রতিভাত হয়েচে। ইউরোপে শিল্পীরা প্রকৃতির অভিনন্দনে উৎসাহিত হ'য়ে তার পায়ে নূপুর পরাতে, মাথায় মুকুট চড়াতে চাননি, তাঁরা সচরাচর চান তাকে চর্ম্ম-চক্ষে এমন ভাবে ধরতে যেন সেটা চোখ দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। আর আমাদের দেশের শিল্পীরা চেয়েচেন তার অন্তরের আহ্বানের দ্বারা তাকে সাজিয়ে তুলতে। একটি হ'ল প্রকৃতির অনুকৃতি অন্যটি প্রকৃতির পূজা। ইউরোপের শিল্পে এবং দেশের শিল্পে ঠিক সেই ভেদই স্পষ্ট দেখা যায়। নকলেতে তাকে বাইরে থেকে স্পর্শ করার আশ মেটে, পূজায় অভূতপূর্ব্ব ভাবে মনকে আকুল ক'রে তোলে। একটি হ'ল দলিত করা অপরটি হ'ল আঘ্রাণ-ভোগ। প্রকৃতির অভিনন্দনে প্রকৃতই যে জাগে তার কাছে শেষের পন্থাই বাঞ্ছনীয় হয়। তবে আমাদের দেশে প্রকৃতিকে উপেক্ষা ক'রে তার রূপ বিকৃতি ও বিকলাঙ্গ করাটাই ভারতশিল্পের প্রধান পরিচয় নয়। কিন্তু প্রকৃতির অন্তরে যে সুন্দর বিরাজ করচে তাকে দেখা এবং তার সঠিক রূপটি সুসামঞ্জস্যভাবে পটের উপর ফলানোই হ'ল আর্টের ধর্ম্ম আর যেখানে ছবিতে মানসিক রূপলোকের সৃষ্টি করার দরকার সেখানে conventional ছাঁদেও ছবি আঁকা চলে। যদি কেবল জীবনোপায় বা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই শিল্প-রচনা হয় তাহলে সেটা হয় ব্যবহারিক শিল্প, আর যেটার মধ্যে আনন্দের আহ্বান নিহীত থাকে সেটা হয় শিল্পকলা। কে বলতে পারে কখন হৃদয়ের কান্নার বেগ জমাট হয়ে একদা আনন্দের রূপে স্ত্রী-বিয়োগ কাতর সম্রাট সাজাহানকে তাজনির্ম্মাণের অনুপ্রাণনা দিয়েছিল। নচেৎ এমন অনর্থক সার্থক শিল্প-রচনা করতে তিনি সমর্থ হতে পারতেন না। তাঁর বিরহ-বেদনা জমাট হয়ে শিল্পের আনন্দের আকারে প্রকাশ পেয়েচে—যা দেখলে লোকের মনেও সেই মধুর বিয়োগ-বিধুর সুরের ঝঙ্কার বাজে। দীপের সল্‌তের আলো নিভলো, বলে গেল শিল্পীকে—যে 'আমি চললুম'; ফুলের পাপড়ি খুলল,—আহ্বান করলে শিল্পীকে নতুন

সৃষ্টিতে। কাজের যে লোক সে কাজ করে চলচে, অলস বসে বসে দিন কাটচ্চে, কিন্তু কোথাও আনন্দ নেই। আনন্দের সাড়া যেখানে সেখানে শিল্পী বসেচেন গান রচনায়, ছবি আঁকতে, মূর্ত্তি গড়তে—প্রাণের উৎস সেখানে উন্মুখ বেগে চলেচে—বাধা কোথাও নেই। তার কি যে আহ্বান, কি যে আনন্দ, তা সৃষ্টি যাঁরা করেন তাঁরাই জানেন।

ছিরি ছাঁদের ফাঁদ পাতাই হল শিল্পীর কাজ; সে ছাঁদে ধরা পড়ে চাঁদ, ধরা পড়ে সূর্য্য, ধরা পড়ে আনন্দের রূপ। রেখার আরেখনে, লিপির আলিম্পনে, ফাঁদ পাতার কাজে সে লাগে;—তার কাছে দুদিনের পাওয়া, দুদিনের চাওয়া, দুদিনের মুক্তি, দুদিনের বন্ধন, সবই এক হয়ে যায় তার অন্তর পূর্ণ থাকে এ সব চূর্ণ ক'রে অনন্তের আস্বাদ পেয়ে। এই পূর্ণতার মধ্যে শিল্পী বাড়তে থাকেন এই হ'ল তাঁর কাজ।

প্রকৃতির দ্বার সকলের জন্যেই উন্মুক্ত। প্রকৃতির লাবণ্য কোনো এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্যে সঞ্চিত নয়, কিন্তু তবু শিল্পীরাই তার রস গ্রহণ করেন আর সাধারণে তাকে অতি সাধারণ ভাবেই মেনে নিয়ে থাকে। জলের ঢেউ তরুপল্লবের মর্ম্মর, পাখীর কূজন ও আদিমকাল থেকেই মানুষ শুনচে, কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে তার স্পর্শ অনুভব করেচেন শিল্পীরা এবং তাই তাঁরা দুনিয়ার লোকের কাছে এমন ভাবে ছন্দে, রঙে, সুরে ডালি সাজিয়ে ধরচেন যা অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় হয়ে সকলের কাছে প্রতিভাত হচ্চে। সমুদ্রের ঢেউ গর্জ্জন করচে নাবিকের ত্রাস জন্মাতে—কবি কিন্তু শুনচেন সাগর সঙ্গীত তার প্রতি ঢেউয়ের মূর্চ্ছনায়। বুলবুল পাখী তো সবাই দেখেন, কিন্তু যিনি পারস্য কবিদের কাব্যের সঙ্গে সুপরিচিত তিনি যদি কোনো উদ্যানে বুল্‌বুল্ দেখতে পান ত তাঁর কাছে বাগানটির সেই সমস্তই একটি পারস্য কবিতা বলে প্রতিভাত হ'বে। মা ও ছেলের সহজ স্নেহবাৎসল্যের ভাব কারও চোখে এমন

উজ্জ্বল হয়ে ফুটতো না যদি না র‍্যাফেলের আঁকা মাতৃ-মূর্ত্তি ছবির সৃষ্টি হ'ত। তেমনি অনেক সহজ সরল প্রকৃতির লীলার মধ্যে যে হাসি লুকানো আছে, যে করুণ কান্না জমাট বেঁধে আছে, তা ধ'রে দেয় শিল্পী। শিল্পকলার কদর তখনই হয় যখন এই সব অজ্ঞাত ভাব রূপকে প্রকট করে। সৃষ্টির সঙ্গে সৃজনের আনন্দ শিল্পীর আনন্দ। তাতে তার অহঙ্কার বাড়ে না, মাথা তার নত হয়ে পড়ে পদে পদে। তার কাছে যখন সৃষ্টির ভিতরের গূঢ় রহস্য একে একে প্রতিভাত হয় তখন সে নিজের সৃষ্টির অক্ষমতাকে বুঝে মেনে নেয় যে মানুষ কত ছোট, কত ক্ষুদ্র। সে কেবল এই বিশ্ব নিয়ন্তার সৃষ্টির রস গ্রহণ করে যখন সে আপন আনন্দ রসে সেটিকে রঙিয়ে নিয়ে ফুটিয়ে তোলে; তখনই সেও অমৃত হয়—অমর হয়। এই আনন্দেই সে গড়ে—অহঙ্কার সব চূর্ণ হয়ে যায়।

শিল্পী তাই সর্ব্বদাই জানচে, সর্ব্বদাই পাচ্চে, এই ভাবে সে সারা জীবন সাধনার পথে চলেচে, তার আর শেষ নেই। কেউ আঁকা শেষ করে বল্লেনা "শেষ করে দিলুম ছবি আঁকার শেষ কথা"। কবি গেয়েচেন—

"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে
আঘাত দিয়ে দেখা দিল আগুন হয়ে জ্বলবে;
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা, সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে।
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে;
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে মরণে ফল ফলবে"।

সৃষ্টিকালে শিল্পী বড়ই একলা থাকেন—কিন্তু তাঁর সৃজিত শিল্প

যখন সকলের জন্যে পরিবেশিত হয় তখন তাঁর উপর তাঁর কোনো দাবী থাকে না এবং একদল রসিক মণ্ডলী তৈরী হ'ন রস গ্রহণের জন্যে। আমাদের দেশে শিল্পীদের বড়ই একা একা আপন মনে গান গেয়ে চলতে হয়। ইউরোপে যেমন প্রত্যেক শিল্পীর পৃষ্ঠ-পোষক, গুণগ্রাহী রসিকদল তাদের উৎসাহ দিয়ে বাঁচান, আমাদের দেশে সে পুরস্কারের কোনোই আশা নেই বরং তিরস্কারটাই সহজলভ্য। আমাদের মনে হয় এইরূপ একলা একলা কাজ করার দরুন শিল্পীদের ক্ষতি অপেক্ষা লাভও যথেষ্ট, কেননা শিল্পীর প্রতিভা সহজে যখন ফোটে তখন সেটার বিকাশ চরম হয়। বাগান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে কেয়ারীর কড়া নিয়মের বাঁধনে বীজের প্রজনন পরীক্ষা করতে গেলে তার ফলে ফুল ফল যে সব সময় সেরা হয়ে উঠে তা নয় বরং এলোমেলো বীজ প'ড়ে বাগানের আনাচে কানাচে যা জন্মায় তাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে ফুটে উঠে বাগানের গৌরব বাড়ায়। শিল্পীর শিল্পও ঠিক এই একই ধর্ম্মে চলে। বাধা বাঁধন মেনে চলা একজামিন পাশ করার কেয়ারীর অর্থাৎ স্টীল ফ্রেমের শাসনে শিল্প খর্ব্বই হয়ে পড়ে—উৎকর্ষ হয় যখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে আপনি অলক্ষ্যে বিকাশ পাবার অবকাশ পায়।

শিল্পী স্বাধীন জীব। তাকে ছেড়ে দিতে হয় আপন মনে কাজ করে যেতে—যেমন কোনো, বাঁধা নিয়মের চাপে তাকে চালালে তার সবই খর্ব্ব হয়, তেমনি তাকে বেশী আন্দোলনের বিষয় করে তুললেও তার সমূহ ক্ষতি করা হয়। অনেকটা যেমন নদীকে যদি তার সহজ গতিতে চলতে না দিয়ে তার দুপাড় মর্ম্মর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া যায় ঠিক সেই রকম। নদীর সহজ পরিণতি হয় যখন সেটি আঁকা বাঁকা উত্থান পতনের গতিতে মাটির সহজ উঁচুনীচু ভাবটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে—তেমনি শিল্পীকে তার আপন পথে অবলীলায়

চলতে দিলে তারও বিচিত্র সৃষ্টিতে জীবনের গতি অলঙ্কৃত হয়ে উঠে। যে প্রকৃতির অভিনন্দনের আস্বাদ পেয়ে সে সারাজীবন আপন ভোলা হয়ে সাবলীল গতিতে চলে তাতে তাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি? বরং তার সৃষ্টির আনন্দে যোগ দিয়ে তাকে উৎসাহিত করে তুললে তার মানসিক পরিণতির পক্ষে সহায়তা করা হয়। তাই আমাদের মনে হয় তাকে নিয়ে আর অন্যের উদ্বেগ কেন? তাকে প্রকৃতির কাছাকাছি হতে দিলেই স্বভাবের উপর ছেড়ে দিলেই সে তার প্রতিভার বিকাশ আপন ক্ষমতা অনুসারে করবে। পাখী যাঁরা খাঁচায় পালন করেন তাঁরা একই স্থানে একই ভাবে চিরকাল তাকে দেখতে পান—প্রকৃতির বিচিত্র বেষ্টনীর মধ্যে তাকে নব নব ভাবে পান না, কিন্তু যাঁরা বনের পাখীকে বশ করতে জানেন তাঁদের কাছে পাখীর রূপ নানা অবস্থায় নানা আকারে ধরা পড়ে।

শিল্পকলার অভিনন্দন শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিনন্দনের বাইরেই হওয়া ভাল। শিল্পী হতে গিয়ে যাঁর অভিনন্দন টিকা তিনি পরেচেন তাঁকে যদি স্মরণ করিয়ে দিতে হয় তো যে কেনো অনুষ্ঠান বরণীয়।

শিল্পে-সৃষ্টি

একদিন আমার একটি ছাত্রকে প্রশ্ন করলুম যে ছবি আঁকতে তাঁর ইচ্ছা হয় কেন? তিনি তার উত্তরে সোজাসুজি জবাব দিলেন "ভাল লাগে বলে"। অবশ্য জবাবটা তিনি ঠিকই দিয়েছিলেন, কিন্তু এই ভাল লাগাটা তাঁর কোথা থেকে আসচে সে কথার তিনি সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না তা' জানা কথা। নানাভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করলে শেষে দেখা যাবে যে যথার্থ কারণ হ'ল এই যে মানুষ প্রতিনিয়ত তার ঘরে-বাইরে বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে 'যে সৃষ্টিকর্ত্তার অলক্ষ্য-হাতের পরিচয় পাচ্চে তারই' অনুপ্রাণনায় প্রণোদিত হয়ে সে সৃষ্টিকার্য্যে মন দিচ্চে। বাগানে বীজ বপন করে গাছটি জন্মালে, হঠাৎ আকাশে কোথাও কিছু নেই, মেঘ এসে বারিবর্ষণ করলে, পশুপক্ষী এবং মানুষের মধ্যে নূতন প্রাণীর আবির্ভাব দেখলে মানুষের মনে সৃষ্টি রহস্যের যে ছাপ এসে পড়ে তাতে সে তখন স্থির থাকতে পারে না নিজে তার সঙ্গে সায় না দিয়ে। তাই তার মনে ইচ্ছা জাগে পাথর কেটে মূর্ত্তি গড়তে, রঙতুলি দিয়ে ছবি আঁকতে, কাগজ পেনসিলে কবিতা লিখতে। বিশ্ব-বিধাতার রাজ্যে যেমন সৃষ্টি-লীলার অন্ত নাই, মানুষের শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি সৃজনীর পরিচয় অনন্ত কাল ধরে চলে আস্‌চে তার ক্রম-পরিণতির ইতিহাস বিশ্ব সৃষ্টির ক্রম-পরিণতির ইতিহাসের চেয়ে কম বিস্ময়কর বা আনন্দপ্রদ নয়।

এখন কেহ যদি বলেন যে সৃষ্টিকার্য্যে সময় দেবার বা নষ্ট করবার দরকার কি? একমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টিতে, তাতে যুদ্ধবিগ্রহ এবং মানুষের নানান দরকারী কার্য্য

সিদ্ধির জন্যে আবশ্যকতা আছে ব'লে, কিন্তু কলাবিদ্যা—যে-কোন কলা, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির প্রয়োজন কি? তা হ'লে গোড়াতেই কেন আমরা ধরে নিই না যে তার সত্যিই কোনো প্রয়োজন নেই? ভাল করে তলিয়ে দেখলে দেখব যে মানুষের অহমিকা যে কার্য্যে চরিতার্থ হচ্চে সেইটেকেই সে বড় করে দেখচে, আর যে কাজ অহমের অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়, সে কাজের উপর আস্থা খুবই কম তাদের। তাই আরো দেখা যায় যে এখনকার মানুষ যাঁরা শিল্প-সৃষ্টি করেন তাঁরা তাঁদের নাম চিরস্মরণীয় করার জন্যে তাঁদের রচনার গায়ে নিজের নাম লিখে রেখে দেন, যদিও প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা তা কখনো করতেন না। তাঁরা ছিলেন আত্মভোলা অহমিকাহীন মানুষ। তাই তাঁদের কাজ ধ্যানের কাজ, বুদ্ধির কাজ শুধু নয় এবং তা ঠিক শিল্প-কাজ। সেই সুপ্রাচীন কাজগুলি শিল্পজগতে এক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আসচে; সেই কারণেই এই অহম্‌টাকে আবার যদি বড় করে দেখা যায় এবং যদি অহমিকতাকে সকলের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে কেউ দেখতে থাকে তাহলেও ব্যাপার হয়ে যায় অন্যরূপ। তখন মানুষের মন যায় না সৃষ্টিকার্য্যে,—তখন মন যায় সৃষ্টির বাহিরে অহৈতুকীর রাজ্যে। তাই আবার কেহ কেহ বলবেন যে 'অহম' ভাব আছে বলেই মানুষ সৃষ্টি করতে চায়, নচেৎ ভূতের বেগার সে খাটবে কেন? তাঁর সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে তার অহমিকারও চরিতার্থতা কি কতক পরিমাণে হচ্চে না?

শিল্পী-মানুষ যদি কেবল দুনিয়াটাকে abstract ভাবে দেখে চলে তা হলে তার সৃষ্টি-কাজে মন যাবে কেন? সে দেখবে তার রচনার এমন কি বিশ্বরচনারও বাইরে এক অপূর্ব্বতা ও অলৌকিকতা আছে যাতে মন তার ডুবে যাবে। নিজের হাতের তৈরী কাজ দশজনে দেখবে তারিফ করবে, এই যে অহমিকা তা তার মধ্যে আর পৌঁছতে

পারবে না। বিশ্ব-সৃষ্টির রস যা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য তাই কেবল মানুষ-শিল্পী তাঁর রচনায় প্রকাশ করেন। তার বাইরে যাবার তাঁর ক্ষমতা নেই। বিশ্বের রস-সৃষ্টির মধ্যে বাস ক'রে তার অতীতে মনকে নিয়ে যাবার শক্তি যে শিল্পীর আছে তাঁর রচনায় আমরা তাঁরই কথা, তাঁরই ছন্দ-রাজত্ব দেখবো, যদি তাঁর পক্ষে শিল্প-কাজ করা সম্ভবপর হয়, কেননা ধ্যান ও যোগ সাধনই তাঁর পক্ষে প্রশস্ত পথ।

এখন কথা হচ্চে বিশ্ব-সৃষ্টির ভিতরে ও বাহিরে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যা আছে তার অনেক দূরের সন্ধানে নিরত মন বহুপরিচিত কাছের পাওয়া ও দেখা জিনিষের রূপ দিয়ে রূপ-রসের অতীত লোকের ছবি কি করে প্রকাশ করবে? এখানেও আবার সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তার মধ্যে মানুষ নিজে নিজেই থেমে যাবে নিজেকে সৃষ্টির এক অঙ্গ ভেবে। নতুবা যদি মন বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে বাহিরের রসানুভূতিকে জাগিয়ে তোলে তার জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের দ্বারা, তবেই শিল্পকলার মধ্যে রস-রূপের সামঞ্জস্য হ'বে এবং অপূর্ব্ব রূপলোকের সৃষ্টি মানুষেরা করতে পারবে।

আবার মনে হয়, abstract ভাবে সব দেখে অভিজ্ঞতার দ্বারা রসের অতীত লোকের অভিজ্ঞতা শিল্পী নব-নব রূপে সৃষ্টি করে দেখাতে পারেন রঙের ও রেখার ব্যঞ্জনার দ্বারা। মানুষের দৃষ্টির অপূর্ব্ব দর্পণে রূপের প্রথম ও প্রধান মানস পরিচয় হয় রেখা ও বর্ণ সমাবেশের ভঙ্গীতে এবং এই রেখা ও বর্ণ রূপ-লোকের যেমন সর্ব্বদা কাজে লাগে অরূপলোকের মধ্যেও তার ধারা অলক্ষ্যে পাওয়া যায়, তার অভিজ্ঞতা কারু কারু আছে। এখন সেইটেই ভাববার কথা যে সৃষ্টিকার্য্য গতানুগতিক ভাবেই চলবে? না—সত্যের সন্ধানে ইন্দ্রিয়াতীত অতীন্দ্রিয়ের ভাব প্রকাশের পথ বার করবে অপরূপ সৃষ্টিকার্য্যের দ্বারা?

শিল্প ও শিল্পীর মন

সকল শিল্পকলার প্রথম ও প্রধান পরখ হচ্চে এই যে সেটি ইটপাথরের মত স্থবির (static) অচল নয়, সেটি চিত্রপটেই থাক, পাথর, ইট, কাঠ, যাতেই তার প্রকাশ হোক না কেন—সেটি সর্ব্বদাই সচল (dynamic)। চিত্রকলায় এই সচলতার কথাই বেশী ক'রে যদি প্রকাশ না পায় তো সে ছবি ছবিপদ-বাচ্য নয় ; একটা কার্পেটের উপর আঁকা প্যাটার্ণের মত নয়ন-প্রীতিকর জিনিষমাত্র। আমাদের দেশে চৌষট্টি কলার বিষয় শাস্ত্রে আছে এবং এই কলা-কৌশল শিক্ষার দ্বারা সকল কাজকেই তখন সচল ও সজীব করে তোলার প্রথা ছিল। ক্রমশঃ আমরা আধুনিক যুগের শিক্ষানুসারে চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যকেই প্রধানত চারুশিল্প (fine art) বলি এবং আরো তিনটি যথা, সঙ্গীত, নৃত্য ও ভাস্কর্য্য নিয়ে ষড়ঙ্গ পূর্ণ করি। এগুলি ছাড়া অন্য সকল কলা-কৌশলকে কারুকলা (minor art) ব'লে থাকি।

চারুকলায় চিত্রাঙ্কনের বিষয় ভাবতে গেলে আমরা দেখি যে এই সচলতার মধ্যে দুটি ভিন্ন রুচির মনের পরিচয় আছে। একটি পরিকল্পনা-প্রধান এবং অপরটি বাস্তব ভাবাপন্ন। ছবির কাছে যখন গিয়ে দাঁড়াই তখন চিত্রকলা আমাদের মনকে নিয়ে যায় তার পটভূমির মধ্যে এবং আমরা যে ঘরে বা স্থানে দাঁড়িয়ে সেটিকে দেখি তার বিষয় আমাদের মন থেকে চলে যায়, এই হ'ল শিল্পকলার আর একটি পরখ। তা ছাড়া যে শিল্প-রচনা যতটা আমাদের মনকে অধিকার করে এবং মনের ভিতর ভাবনার সচলতা আনে ততটাই তার হ'ল কাজ। তাই দেখা যায় লোকের দুঃখের সময় কোনো একটি বিশেষ ধরনের ছবি দেখে মনকে অভিভূত ক'রে তোলে। আবার কখন

কখন মানুষের মন একেবারেই তৈরী থাকে না শিল্পকলাকে গ্রহণ করার জন্য। তাই শিল্পকলায় প্রাচীন শাস্ত্রে নবরসের পরিবেশনের ভার আছে শিল্পীদের হাতে। কিন্তু সকলে ভাবেন যে শিল্পীদের বুঝি জগতে কোনোই কাজ নেই। পৃথিবীতে বসবাস করাকে চারু-সুন্দর ও ভাবপূর্ণ ক'রে তোলেন শিল্পীরা। অস্কারওয়াইল্ড তাই দেখিয়েচেন যে টার্ণার যদি লণ্ডন শহরের কুৎসিত ধোঁয়াটে ভাব (fog) ছবিতে ফুটিয়ে তুলে তার ভিতরকার মাধুর্য্যকে টেনে না বার করতেন তো লণ্ডনের এই ধোঁয়া চিরদিনই মানুষকে দুঃখ দিত। এর ভিতরকার ভাব-ঐশ্বর্য্যের খোঁজ কেহই পেতো না। শিল্পীদের মধ্যে স্থপতি দেখেচেন ঘরবাড়ীগুলি এমন করে গড়ে তুলতে যাতে মানুষের মনে এক আধ্যাত্মিক ভাব জাগে এবং তার চিন্তা-শক্তির প্রসার হয়। ভাস্কর গড়চেন রূপ যাতে মানুষের মনের রকমারী ভাবকে পাথরে, মাটিতে, ধাতুতে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারেন। তিনি দেখাচ্চেন যে এই সকল মূক সামগ্রী মানুষের হাতে জীবন্ত হ'তে পারে এবং মনের সকল কথা তাদের দ্বারা বলানো যায়। বিশেষ ভাস্কর্য্যকলায় শিল্পীর মনকে সকলদিক থেকেই তার গড়া জিনিষটি অধিকার করে। এখানে মানুষের মধ্যেকার 'অহম্'—মানুষের গড়া মূর্ত্তিতে বর্ত্তায়। ভাস্কর্য্যকলা তাই সচেতন হ'য়ে যেন দর্শককে বলে "আমায় দেখ,—আমায় দেখ"। ভাস্কর্য্যকলার এই এক বিশেষত্ব। আবার চিত্রকলায় মানুষ যা কিছু বাস্তব জগতের মধ্যে সুন্দর চোখে দেখেন তারই রূপছন্দ চিত্রপটে সাজিয়ে তোলেন। আবার আর একদল আছেন যাঁরা চিত্রকলায় কল্পনার দ্বারা রূপ সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় শিল্পীরা প্রধানতঃ বাস্তব ভাবাপন্ন শিল্পী এবং প্রাচ্য শিল্পীরা হলেন পরিকল্পনাপন্থী।

যখন শিল্পীর মন স্থবির বা জড় হয়ে ওঠে, তখন তার পরিকল্পনা শক্তিও খাটো হয়ে আসে। তখন সে কলা-কৌশলের যত প্রকারের ক্ষেত্র বা পদ্ধতি (technique) আছে তার অনুসন্ধান করতে থাকে

এবং একশাখা হ'তে শাখান্তরে নিয়ম প্রণালী খুঁজে খুঁজে জীবন কাটায়। তখন সে হয়ত একবার বাঙলার 'পট', জৈনি ছবি, বা কোনো বিখ্যাত জাপানী, চীনা বা ইউরোপীয় শিল্পীর নকলে তুলি চালাবার চেষ্টা করে এবং পরীক্ষা করার দোহাই দেয়। আমাদের দেশে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেশের কলা-কৌশলের (technique এর) মূল সূত্রের সন্ধান দিয়েছিলেন আমাদের কাছে কিন্তু আমরা অনেকে তা' গ্রহণ করেছি এবং অনেকে তার অগ্রদূত হয়েও দিশেহারা অবস্থায় অবশেষে নানা দেশের শিল্পকলার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়েচি। এখন মাঝে মাঝে মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে দেখি কখন কখন কোনো নামজাদা শিল্পী কুৎসিত ও বিকল ভাবে বিচিত্র ছবি আঁকার চেষ্টা করচেন নূতনত্বের দোহাই দিয়ে, কিন্তু তাঁর ছবিটি যে তিনি অযত্নসহকারে এঁকেচেন সেই কথাই বেশী প্রকাশ পাচ্চে। আবার আমরা সেই সঙ্গে যদি সেঁজা (Cezanne) বা ভানগফ্ (Van Gough) প্রভৃতি ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পীদের অসমাপ্ত ছবিগুলি দেখি তো দেখব যে শিল্পীরা সেখানে তুলির রেখায় একটা অদ্ভুত শক্তির বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে যেন থেমে গেচেন। একটি হ'ল শিল্পীর মন যা' কেবল নূতনত্ব দেখানোর দিকে বিশেষভাবে যায় এবং অপরটিতে অসঙ্কোচ মনের অবাধ গতির কথাই তার কাজের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। মনের একটিতে পঙ্গুতা এবং অপরটিতে একটি বিশেষ জাগরণের পরিচয় আমরা পাই চিত্রকলার মধ্যে।

মানুষ জাগে ও ঘুমায়। তার ঘুমের সময় সে জানে না যে সে কোথায় আছে, তাই তখন তার সকল কলকব্জাই বন্ধ থাকে। আবার যে মানুষ জেগে থেকেও ধ্যানের দ্বারা নিজের শরীরকে ছাড়িয়ে উর্দ্ধে ওঠে—তারও একটা দিক আছে। সেই তুরীয়ভাব যোগীদের একটি বিশেষ অবস্থা। মানুষের মনে যখন এই যোগভাব আসে তখন তার কাছে কোনো পার্থিব জিনিষের রূপ বা আকার দেবার আকাঙ্ক্ষা

থাকে না। তাই শিল্পীদের পক্ষে তাঁদের জাগরণের কথাই বেশী ক'রে তাঁদের কাজে প্রকাশ পায়। কেহ যদি ধরা-ছোঁয়া যায় না এইরূপ abstract art ভাবের চিত্রের কথা বলেন তো সেখানেও একটা কিছু-না-কিছু আকারগত ভঙ্গী যা' 'সুষুপ্তির' মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে আমরা পাই—অন্ততঃ তারও অভিব্যক্তির প্রয়োজন হ'বে। আমরা স্বপ্নে যে সব অদ্ভুত বা কিম্ভূত আকার পাই, এই প্রকার abstract চিত্রে তারই রূপ ফোটাতে পারি। কিন্তু যখন যোগের দ্বারা তুরীয়ভাব আসে তখন আর কোনো আকার বা আধারই চোখে পড়ে না। সেই জন্যই আমরা বলি যে একটা আকার যা' চিত্রপটে হোক, মাটিতে, পাথরে বা যে কোনো ধাতুতে গড়া হোক—সেটির ভিতর শিল্পীর জাগ্রত-প্রাণের ছোঁয়াচ কতখানি লেগেচে তা' স্পষ্টই ধরা পড়ে। শিল্পীর মনের পরিচয় শিল্পীর তুলিকায় কোনো-না-কোনো উপায়ে প্রকাশ হ'তে থাকবেই। আদিম মানুষের আঁকাযোকায় তাই আমরা পাই তাদের বিপদ-সঙ্কুল জীবনের অভিজ্ঞতার পরিচয়, জন্তুজানোয়ার প্রভৃতি শীকারের ছবি আঁকার মধ্যে। আবার আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন শিল্পের মধ্যে ধর্ম্মানুশাসনে বর্দ্ধিত শিল্পীদের মনের পরিচয় পাই। এখনকার অতি-আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের মধ্যে দেখচি যে মানুষ মন-বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্বারা দীক্ষিত হওয়ায় আর এক অপূর্ব্ব শিল্পকলার অভ্যুদয় হয়েচে। এখন পাথরের মূর্ত্তি গড়্‌তে গিয়ে শিল্পী ভাবচেন পাথরের নিজস্ব গঠনের স্বরূপটি বা প্রকৃতিগত উপাদানের পার্থক্যের কথা ;—গঠিত বিষয় (subject matter) সেখানে খর্ব্বিত হচ্চে। যেমন ধর, একটি পাথর যদি শক্ত গ্রানাইটের উপাদান সমষ্টি হয় এবং তাতে যদি কোনো মূর্ত্তি খোদাই করা হয় তা'হলে শিল্পী তাঁর গড়া মূর্ত্তিটিতে এমন আকার দেবেন যাতে তার সেই গ্রানাইটত্ব বিশেষভাবে প্রকট থাকে, তাতে গড়া মূর্ত্তির আকার বা ভাব যেরূপই হোকনা, তাতে

কিছুই আসে যায় না। মূর্ত্তির বিষয়ভাবটি এখানে গৌণ-স্থান অধিকার করচে, গ্রানাইটই এখানে মুখ্য। তেমনি আধুনিক ইউরোপে বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে চিত্রকলায় ও অণুপরমাণুর কথায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে যা' জানা গেছে সেই জ্ঞানের উপরই নির্ভর ক'রে চিত্রকলার ও রীতিপদ্ধতির অদল বদল হচ্চে। বৈজ্ঞানিকেরা সকল জিনিষের উপাদান বস্তুর অণুপরমাণুকে পরকলা (prism) সদৃশ ব'লে অনুমান করেন। তাই আধুনিক শিল্পী তাঁর চিত্রকলায় বর্ণিত বিষয় বা প্রতিকৃতিটিকে এইরূপ পরকলার মত ক'রে প্রকাশ করার চেস্টা করচেন। আমরা একেই cubism বলে জানি। তেমনি আধুনিক স্থপতি বাড়িটির আকারটিকে এমনভাবে গড়ে তুলচেন যাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হাওয়া বাতাস খেলে এবং ধূলা ধেঁায়ায় সহজে না নষ্ট হয়। তাই সরল রেখার এত বাড়াবাড়ি এবং বাড়িগুলিকে সাজান প্যাকিং বাক্স বলে মনে হয়। এইরকম মনোভাবের পরিবর্ত্তন যুগে যুগে হচ্চে এবং তারই তালে তালে শিল্পকলা চলচে। তবে সহজ পরিবর্ত্তন সমাজ সংস্কারের বিবর্ত্তনের সঙ্গে এক, আর নিছক অনুকরণ আর এক জিনিষ। সাধারণতঃ চিত্রকলার মধ্যেও শিল্পীর আঁকা চিত্রের রেখা ও রঙের ভঙ্গী দেখে ধরা যায় যে তার মধ্যে কতখানি সজাগ ও কতখানি সুপ্তির ভাব আছে।

শিল্পকলার মধ্যে আবার আর একটি বিষয় বিশেষভাবে দেখতে হয় যে চিত্রবর্ণিত বিষয়টিকে রঙে, রেখায় কতখানি স্পষ্ট করা হয়েচে। সেখানে শিল্পীর মন খোঁজে—দর্শকের মনকে জানতে। কোন কোন শিল্পী দেখেন যে তাঁর ছবিটিতে কোন্ রেখাটিকে বিশেষভাবে ফোটালে বা কোন্ ভঙ্গী দিলে তবে তাঁর ছবির ভিতরকার সৌন্দর্য্য ভাল ক'রে সকলের চোখে পড়বে। অবশ্য এক্ষেত্রে শিল্পীকে দর্শকের কোঠায় নিজেকে ফেলতে হয়। আবার তাঁর অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি অনেক বিষয় জানেন। যেমন ছবির মধ্যে কেবল কতকগুলি সমান্তরাল

বা ঋজু রেখার সমষ্টি টান্‌লে সেটির জীবন্ত বা সচল গতি আহৃত হয়, একথা শিল্পী মাত্রেই জানেন। আবার রঙের মধ্যেও ওজন আছে। যেমন জমির রঙের চেয়ে আকাশের রঙ হাল্কা হয়ে থাকে, তেমনি সকল সময় হাল্কা যে-কোনো রঙকে ভারি যে-কোনো রঙেরই উপরে স্থান দিতে হয়। এমনি সকল শিল্পীরই অভিজ্ঞতার দ্বারা মনকে পূর্ব্ব থেকেই তৈয়ার রাখতে হয়। তা ছাড়া আছে জাতিগত, সমাজগত ও বংশগত সংস্কার। এতে মানুষের ভাল-লাগা-না-লাগার অনেক কথা আছে। মন সেখানে হয়ত সায় দেয়না একটি বিশেষ রেখা বা রঙ দেখলে। কেউ বলে—"আমার সাদা ভাল লাগে না," কেউ বলে—"আমার লাল ভাল লাগে না" ইত্যাদি। অনেক সময় তাই এই সকল সংস্কারের মধ্যে মানুষ হয়ে শিল্পীর যা' অবস্থা ঘটে তা-ও তাঁর শিল্পকলার মধ্যে ধরা পড়ে। আধুনিক ইউরোপ ভিক্টোরিয়ান যুগের সকল আদর্শকে একে একে ত্যাগ করতে বসেচে। তখনকার শিল্পীদের মত এখন তারা চিত্রের বর্ণিত বিষয়ের দিকে একেবারেই মন দেন না। একটি গালিচা বা পর্দ্দার ছিটের মধ্যে যেমন আমরা বর্ণিত বিষয়ের কোনো খোঁজ পাই না, কেবল দেখি তার সৌষ্ঠব, এগুলিও ঠিক তাই। ছবি এখানে একটা অচল পট যাতে রেখা ও রঙে ছন্দ-বিন্যাসের চেষ্টা হয়েচে মাত্র। এই যে একটা বিশেষ মনোভাব দিয়ে এখন চারুকলাকে দেখা হচ্চে এর মধ্যে আছে এযুগের (**Intellectualism**) জ্ঞানতত্ত্ব ও ব্যবসাবুদ্ধি। এখনকার যুগ-ধর্ম্মই এই দুই ভিত্তিতে স্থাপিত। ব্যবসাবুদ্ধিপ্রসূত মনে ছবিকে কেবল **Pattern** বা কারুসজ্জার উপকরণে পরিণত না করলে তার মধ্যে নূতনত্ব আনা যায় না। তাই এই সকল না-ভেবে ও সহজে শিশুর মত ক'রে আঁকা চারুকলার দ্বারা চারুকলার নূতনত্বের অভাব মেটানো হচ্চে।

আবার কোনো শিল্পী যদি তাঁর বৈজ্ঞানিক মনকে জাগান এবং প্রকৃতির মধ্যে ঠিক যেরূপ দেখেন তা নয়, যা জানেন সেই বৈজ্ঞানিক

জ্ঞানের প্রতিই বেশী আস্থা রাখেন, সত্যের খাতিরে তাহলে চিত্রের পারিপ্রেক্ষিক বিজ্ঞান পদ্ধতি একেবারেই ভেসে যায়। কেন না আমরা চোখে দূরের জিনিষকে ছোট দেখলেও মনে মনে বেশ জানি যে সে জিনিষটি আসলে কত বড় এবং কত উঁচু। সুতরাং দূরে আছে ব'লে বড় জিনিষকে জেনে-শুনে ছোট ক'রে আঁকা এক হিসাবে অসত্য। তাই এখানকার Surrealism যা শিল্পে দেখা দিয়েচে তার মধ্যে পারিপ্রেক্ষিকের কোনো বালাই নেই। শিল্পের মধ্যে আমরা পাই শিল্পীর মনকে এবং যদি কেবল নিজের মনের দ্বারাই শিল্পকলাকে দেখি তো আমরা তার বাইরেই থেকে যাব—তার অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। শিল্পীর মনস্তত্ত্বের খোঁজ তাঁর কাজেই থেকে যায় যুগে যুগে। শিল্পীকেও আবার কখন কখন ভাবতে হয় তাঁর কাজকে সকলের মনের কাছে কি ভাবে পৌঁছে দেবেন তার উপায় বার করার জন্যে। কিন্তু সাধারণতঃ এরূপক্ষেত্রে শিল্পীর নিজের যা দেবার আছে তা থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হয়। তাই অনেক শিল্পী আঁকেন বা গড়েন আত্মভোলা হয়ে, ভাবেন না যে তাঁর কাজকে কেউ দেখবে বা সে বিষয় নিয়ে ভাব্‌বে। যেখানে শিল্পী কোনো অর্থশাসনকে মেনে চলেচেন সেখানে তার একটা বাঁধাধরা রূপ প্রকাশ পেয়েচে। যেমন Byzantine School এর ছবিতে বা আমাদের দেশের প্রাচীন জৈন ধর্ম্মের পুঁথির চিত্রগুলিতে। তার মধ্যে দেখি যে ধর্ম্মযাজকদের মনস্তত্ত্বে গড়ে উঠা শিল্পীদের হাতের কাজ। আবার তেমনি অজন্তার চিত্রকলায় বৌদ্ধ শিল্পীরা অবাধ সাবলীল লীলায় তুলি চালিয়ে গেছেন। চিত্রগুলি তাই কেমন জীবন্ত আজও রয়েচে, এখানে শিল্পীর মন উন্মুক্ত, তাই তাদের কাজের মধ্যে শিকলে বাঁধা ভাব আমরা পাই না। ইউরোপে বাস্তব ভাবের শিল্প (Realist) বা Romantic art ব'লে এতকাল চলে আসছিল, তারও একটা Dogma বা দৃঢ় আচার পদ্ধতি খুব বেশী

দেখা দিয়েছিল এবং তারই দল আজ আবার মুক্তির আস্বাদ পেতে চাচ্চেন নানাপ্রকার প্রচলিত পন্থাকে ডিঙ্গিয়ে একটা নূতনত্ব আনবার চেষ্টা ক'রে।

মানুষের মন কখনও অচল ভাবে একটা কিছুকে অবলম্বন ক'রে চিরকাল থাকতে পারে না। একই জীবনে একই লোকের মনের ধারার ক্রমশঃ কিরূপ পরিবর্ত্তন হ'তে দেখা যায়। তেমনি শিল্প-কলার ইতিহাসে দেখা যায় শিল্পীদের মনের গতি কেমন সচল। একটা ধারা থেকে অন্য একটি ধারা কিরূপ কেটে বের হয় তা-ও দেখবার বিষয়। ইউরোপে Byzantein শিল্প যা' প্রাচ্য-শিল্পকে অবলম্বন করে এবং ধর্ম্মের বাহন হয়ে মনুষ্য সমাজকে তার একটা বিশেষ দিক দেখালে তখন আবার বাস্তবপন্থী এসে আগেকার সকল শিল্প শিক্ষার বাঁধন আল্গা ক'রে দিলে। ক্রমশঃ দেখা যায় এই বাস্তবপন্থীরও হার হ'ল যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে Cezamne যখন অল্প একটু তুলির টানে অনেকটা ভাবকে ফোটাবার চেষ্টা করলেন। এখানেই শিল্পীর মন থেমে যায়নি। এলো বিজ্ঞানরুচির কাল এবং শিল্পীরা মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে শিল্পকলাকে দেখতে আরম্ভ করলেন, তারই ফলে আজ শিশুদের কাঁচা হাতের কাজের মত ছবির আমদানী হয়েচে এবং আদি-অসভ্যদের গড়া মূর্ত্তির মত ভাস্কর্য্য-কলা দেখা দিচ্চে। এই সকল আদিম মানুষের শিল্পের মধ্যে যে মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তারই তথ্যের উপর ভিত্তি হ'ল এখনকার এই Epstnie প্রভৃতির গড়া ভাস্কর্য্যকলার। এম্নি করে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে শিল্প ও শিল্পীর মন যে ভবিষ্যতে আরো কতদিকে ছুট্‌বে তা' কে বল্‌তে পারে?

শিল্পীর মনকে পূর্ব্বেই বলেচি যে তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ক'রে তোলে। বিশেষ ভাবে এর পরীক্ষা করা চলে ছোট ছেলে যখন ছবি আঁকতে সুরু করে তার মধ্যে। তাদের সরল মনের

ছাপ তাদের আঁকা ছবিতে সহজে ধরা পড়ে। আমি জানি একটি পাঁচ বৎসরের মেয়ে, সে ছবিও আঁকে আর জীবজন্তুও খুব ভালবাসে। ছবি আঁকতে গেলে মানুষের হাতপাগুলি তার পোষাপুষি বেড়ালের থাবার মত হয়ে যায়। তেমনি যে ছেলে মোটর বা রেলগাড়ী ভালবাসে তার ছবিতে তারই ছাপ থাকবে। এই শিশুদের মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আবার কত পরিবর্ত্তনই না ঘটে। অনেক বড় অভিনেতার দেখা যায় বাল্যকালে পল্লীগ্রামে কাটানোর দরুন তার কথার মধ্যে গ্রাম্যতাদোষ দূর হয় না, তেমনি চিত্রশিল্পী বা ভাস্করদের কাজের মধ্যেও দেখা যায় যে, তাঁদের রুচি মনের দিক থেকে কতটা পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হয়েচে।

শিল্পীকে বুঝতে হ'লে তাই তার মনের দিক থেকে তাকে চিনতে হয়, তার শুধু কারিগরির বহর বা রকমারীত্ব দেখে তার বিচার করলে চলে না। কারিগরি শিল্পী শিখ্‌তে পারেন চেষ্টার দ্বারা বাইরে থেকে, কিন্তু পরিকল্পনা বা কবিত্ব-শক্তির বিকাশ হয় তাঁর মনের সংস্কার হলে। সেই ভাবের দিকেই শিল্পীর দৈন্য বা ঐশ্বর্য্যের খোঁজ আমরা পাই। কেবল abstract pattern হিসাবে যা এখনকার commercial world এ (দোকানদারী—পৃথিবীতে) ছবি ব'লে চালাবার চলবে তার একটা সীমা আছে, কিন্তু ভাবের বা পরিকল্পনার দিকে শিল্পকলার আর শেষ নাই। আমরা দেখি ইউরোপে Romantic art যা ভাবকে ও ভাববার বিষয়কে অবলম্বন ক'রে এত কাল গ'ড়ে উঠেছিল তার জের এখনো মেটেনি এবং কখনও মিটবে না। কেন না, সেখানে শিল্পী ও শিল্প-রসিক উভয়েরই মন ভাববার খোরাক পায়। তাই আজও ইউরোপীয়দের মন থেকে madona র মাতৃত্ব এবং লিওনার্দো ভিনিচির আঁকা শেষ ভোজের ভাব হৃদয়কে জুড়ে বসে আছে—এবং পরবর্ত্তী যুগেও অধিকার করে রাখবে ব'লে ভরসা করা যায়। যা abstract বা pattern এর মত ভাবে আঁকা চিত্রকলার আজকাল

রেখা ও রঙের বিন্যাস দ্বারা চলচে, তার শেষ হবে—কাপড়ের ছিট বা কার্পেটের নক্সায় পরিণত হ'য়ে এবং তার উর্দ্ধে তার স্থান নেই। শিক্ষা ও সংস্কারের দ্বারা শিল্পীর মন কি ভাবে কাজ করে তার পরিচয় আমাদের দেশের আধুনিক শিল্প-কলায় পাই। আমরা তাই আজ আমাদের দেশে দেখচি যে কালিদাস বর্ণিত মেঘদূতের ভাবকে শৈলেন্দ্র নাথ দে, বৈষ্ণব কবিবর্ণিত রসভাবকে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, পৌরাণিক গাথার ভাবগুলিকে নন্দলাল বসু চিত্রকলায় অক্ষয় ক'রে রেখেচেন তাঁদের তুলিকায়; কিন্তু তার উর্দ্ধে আবার আমরা দেখি কবিত্ব ও পরিকল্পনায় ঐশ্বর্য্য দেখিয়েচেন শক্তির হাতে তেজকে ধরিয়ে দিয়ে অভিনব রূপ-কল্পনায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। কল্পনাকে কত উর্দ্ধে—কত দূরে এগিয়ে দিয়েচেন, এবং অঙ্কন-রীতি পদ্ধতির (technique) কথা বা প্রশ্ন মনেই আসে না। এক গগনে এক চন্দ্র জ্বল্ জ্বল্ করচে!

শিল্প ও রসসৃষ্টি

অন্তরের রস তেজের প্রতিচ্ছবি; যাতে রস নেই তা শুষ্ক ও তেজহীন। তাই দেখা যায় কখন কখন একটি সাধারণ পটুয়ার কাজের মধ্যেও সজীবতা সঞ্চারিত হয়ে আছে রেখায় রেখায়। আবার তেমনি অনেক শিক্ষিত শিল্পীর কারিগরির মধ্যেও কখন কখন প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না। হয়ত নানান ভাবে তিনি সুপটু হস্তে কলাকুশলতার (technique) পরিচয় দিচ্চেন কিন্তু রস তাতে পাওয়া যাচ্চে না মোটেই। এমনও দেখা গেছে যে কোনো কোনো শিল্পীর প্রাথমিক প্রারম্ভের কাজে যেরূপ প্রাণের পরিচয় পাওয়া গেছে তার পরবর্ত্তী পাকা হাতের কাজে তা একেবারেই বিরল হয়ে পড়েচে। কেবল হয়ত কলাকুশলতার বাহ্য প্রকাশই তাতে ধরা পড়েচে।

তেজ শক্তিকে আমরা অনুভব করি পদে পদে কিন্তু জানবার বা ভাববার কোনই চেষ্টা করি না তার বিষয়। যখন সমুদ্রের দিকে তাকাই তখন তার ঢেউ ও লহরগুলি নেচে নেচে চলেচে দেখি; যখন আগুনের দিকে তাকাই তখন তার হল্কার উপর কে যেন দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠ্‌চে অনুভব করি :—আবার প্রতিদিন চলি ফিরি তারও মধ্যে একটি শক্তি কাজ করচে তা জানি কিন্তু তাকে খুঁটিয়ে দেখবার অবকাশ নেই আমাদের। শিল্পকলায়ও তাই, শিল্পী যখন কাজ করেন সজাগভাবে অর্থাৎ যখন শিল্পী বোঝেন যে সচল তেজের স্ফুলিঙ্গ এগিয়ে নিয়ে চলেচে তাঁর তুলিকা বা লেখনীকে অনির্দ্দিষ্টের ও 'অনির্ব্বচনীয়ের দিকে, তখনই তিনি সৃষ্টি করেন যথার্থ রসরূপকে। নতুবা তাঁর সৃষ্টি হয় কেবল পকেট ভরবার জন্যে অর্থকরী কারিগরি মাত্র।

মন গতিশীল তাই 'মনে যা' লাগে তাই 'রস'—আর যা' মনে ধরেনা কেবল কাজে লাগে মাত্র তাই নীরস। কাজে যা' লাগে কাজ শেষ হলেই তার খোঁজ কেউই কখনো রাখেনা; আর যা রসসংযুক্ত হয়ে প্রাণ পায় তার মূল্য কাজের অতীত। এই হল আর্টের প্রথম ও প্রধান পরখ। তা ছাড়া, রসসৃষ্টি কখন বাঁধাধরা নিয়মের ধার ধারে না। ব্যবহারিক কাজই সময়-সাপেক্ষ। 'রুটীন' মত অফিস করা যায়, ফ্যাক্টরী চালানো যায়, কবিতা লেখা বা চিত্র রচনা চলে না। রসসৃষ্টির কাজ যা সাহিত্য ও শিল্প-কলায় মানুষ করে তার গতিশীলতার পরিচয়ের মধ্যেই তার তেজশক্তির নজির আছে। তাজমহল তৈরী হ'ল শাহী-সময়ে, আজও তার রস ফুরালো না। কবে গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস কাব্য রচনা করে গেচেন আজও তা পাঠ করলে চোখে জল ভরে আসে। সেক্সপীয়র ও কালিদাস বেজায় সেকেলে কিন্তু তার ভাষা যতই পিছনে পড়ে থাক না কেন, তার কাব্যরসে ভাটা পড়েনি, আজও হৃদয় আর্দ্র হয়ে ওঠে পড়লেই।

কেবল কলাকুশলতার (technique) দ্বারাই শিল্পকলার পরখ হয় না; কেননা দেখা গেচে অনেক বড় শিল্পীর কারিগরির দিকে কোনো লক্ষ্য নেই কিন্তু তাঁদের কাজের মধ্যে বিশ্বজনীন রসভাব ভ'রে আছে, দেখলেই হৃদয়কে স্পর্শ করে। এই রসভাবের স্ফূর্ত্তি পায় মানুষের চিন্তার গতিশীল ক্রমবিকাশের মধ্যে, সেখানেও তার তেজশক্তিরই পরিচয় আছে। এই ক্রমবিকাশ ঘটে নানা কারণে। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন বা আব-হাওয়ার গুণে; বংশগত কৃষ্টির বা সংস্কৃতির দ্বারা এবং সাধনার দ্বারা জ্ঞান ও বুদ্ধির সংস্কারের বা পরিমার্জ্জনার জন্য। তাই দেখা যায় যে একটি লোকের চোখে যে রঙ বা রূপ ভাল লাগচে অপরের চোখে সেটি একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। তাই একের স্বাদে

অন্যে পরিতৃপ্ত হয় না, যদিও ফ্যাসনের খাতিরে তা ক্ষণকালের জন্যে হ'তে দেখা গেছে এই পৃথিবীতে কখন কখন এই মনোভাবের বিভিন্ন কোঠা আছে। তাকে সত্ব, রজ তম এই বিশেষ গুণে মণ্ডিত করেচেন আমাদের প্রাচীন মনীষীরা। এই তিন ভাবের মধ্যেও বিবিধ রসের ব্যঞ্জনা আছে যথা, কাব্যে যাকে নবরস বলে। এই সকল রসের পরিবেশন মানুষ করে শিল্প ও কাব্যকলায়। যুদ্ধবিগ্রহে রাষ্ট্রশাসনে তা কোনো কাজেই লাগে না বটে কিন্তু মনুষ্য-সমাজে রসপরিবেশনে বিশেষ প্রয়োজন আছে তার।

দেশের কৃষ্টির ও সংস্কারের মধ্যে, সামাজিক আচার পদ্ধতির আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হয়ে দেশকাল-পাত্রহিসাবে শিল্পকলার ক্রম-বিকাশ সর্ব্বত্রই হয়ে থাকে। এর কোনো একটি বিশেষ পথ নির্দ্দেশ কেহই করতে পারেন না। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পের সঙ্গে তুলনার দ্বারা দেশবিদেশের প্রাণ-শক্তিকে বোঝা যেতে পারে মাত্র।

তবে শিল্প-কার্য্যে মানুষের কতখানি চেষ্টা এবং কতখানি যে অন্তরের প্রেরণা নিহিত আছে তা' নির্ণয় করা শক্ত। এইটুকু মাত্র বোঝা যায় যে শিল্প রচনার মধ্যে যে চেষ্টা আছে তাতে স্বার্থের পরিচয় নেই, আছে নিষ্ঠার এবং আনন্দেরই পরিচয়। তা ছাড়া স্বার্থের বাইরের কাজ শিল্প-কাজে সত্যরূপে প্রকাশ পায় বলেই তা' রসসৃষ্টি। তাই শিল্পীরা বাঁধাধরা কাজের পক্ষপাতী নয়, শিল্পী নিজের কাজে পায় মুক্তির স্বাদ। এই মুক্তির ভাবই রসসৃষ্টির সহায়ক।

চিত্রকলা ও ভাবরূপ

চিত্রকলার আসল সার্থকতা যে কোথায়, এই নিয়ে একটা তর্ক উঠতে পারে। চিত্রকলা জৈবিক বিজ্ঞানের (biological science এর) সহায় নয় বা কার্য্যকরী-কলার (technological artএর) মধ্যেও তার স্থান নেই। তবে এটা যে চাক্ষুষ দর্শনের আনন্দ-অভিব্যক্তি তা প্রস্তর যুগের আদিম মানুষের গুহাগাত্রে চর্ব্বি দিয়ে আঁকা চিত্রকলা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা এঁকেছিল যা দেখেছিল স্বচক্ষে এবং তার সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগমাত্র সেইখানেই! প্রকৃতির বাহ্যরূপ থেকে যা দেখেছিল সেই কথাই তাদের সেই গুহার গায়ে আঁকা আদিম চিত্রকলা থেকে আমরা পাই। আদিম ছবির বিষয়বস্তু প্রকৃতি থেকে নেওয়া হলেও তার আঁকার মধ্যে যে আঁকারগত অমিলটি আমরা পাই, আদিম শিল্পীদের কেবল অশিক্ষা বা বর্ব্বরতার পরিচয় বলে এখন উড়িয়ে দিলে চলে না। এখন আমরা বিচার করতে বসেচি যখন আমাদের সামনে যুগ যুগের সঞ্চিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফল আমাদের নিকট সুলভ। যদি আমরা একবার সেই আদিম কালের অসংস্কৃতির যুগে নিজেদের মনকে প্রবেশ করাতে পারি ত দেখব যে তখন মানুষেরা যা দেখেচে তাই কেবল গ্রহণ করেচে তাই নয়, দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপকল্পনায় যা ভেবেচে তাও সে এঁকেচে। আদিম মানুষের অসংস্কৃত প্রকৃতির খবর প্রত্যেক আধুনিক মানুষের শৈশবে দেখা ও আঁকার মধ্যেও আমরা কতকটা পাই। মানুষ জৈবিক জগতের আদিম ভ্রূণপত্রের ভাব থেকে ক্রমশ জন্তুর ভাব এবং পরে শৈশবে আদিম মানুষের ভাব নিয়ে ক্রমবিকাশ পায় জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, সে কথা বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই জানা আছে। অতএব সেই আদিম মানুষের ছবি আঁকার সঙ্গে শিশুদের আঁকা ছবি যে কি কারণে মিলে যায় তা এ

থেকে আমরা বুঝতে পারি। এই দেখার ভিতরে কোনখানে কতটা সত্য-দেখা নিহিত আছে এবং কতটা কল্পনাপ্রসূত সেই কথা তা থেকে আমরা গবেষণা দ্বারা জানতে পারি। কেননা আমাদের এখন শিক্ষা ও সাধন সংস্কারের দ্বারা এবং আতপচিত্রের আবিষ্কারের দ্বারা প্রকৃতির আকারগত সঠিক রূপ প্রায় সমস্তটাই ধরতে পারি। কিন্তু এখানেই আমরা আদিমদের কাছে পিছিয়ে পড়ি যেখানে সে তার নিজের মনোগত ভাব-পরিকল্পনা জুড়ে দেয়। আমরা প্রকৃতির সবটা পারি ধরতে, পারি না শুধু সেই ভাব-পরিকল্পনাকে সেখানে দেখতে। তাছাড়া আদিম মানুষ তার দেখার মধ্যে যেমন সবটা দেখে না বা দেখতে পায় না তেমনি শিক্ষিত অনেক আধুনিক শিল্পী আছেন যাঁরা ছবির ভিতর মানুষের চেহারা বা গঠন আকৃতি আঁকতে গেলে তাঁদের নিছক সংস্কারগত একটি বিশেষ রূপই (type) বার বার ফোটান, মনুষ্যজগতে আকারে প্রকারে বর্ণে ও ভাবে যে মধুর বৈচিত্র্য আছে তা তারা দেখেও দেখতে পান না। এক্ষেত্রে তারাও সেই আদিম শিল্পীর মত অক্ষমতারই পরিচয় দেন।

শিল্পীরা যখন কিছু দেখে এবং মনে রাখবার ইচ্ছাতে দেখে তখন তার দেখার বিশেষত্ব এই যে তার বিচার-বোধও শিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত হওয়ায় অগ্রহণীয় যা তা বাদ দিয়ে দেখে এবং যা গ্রহণীয় সেটিকে তার মনের মধ্যে গোড়াতেই এঁকে রাখতে ও মনে রাখতে পারে। অবশ্য এটা মনের অন্তস্তলে থাকে চাপা এবং ফুটে বেরয় তার কলা-কৌশলের মধ্যে। সাধারণ মানুষ এভাবে জিনিষ দেখে না। এই দেখার মধ্যে থাকে শিল্পীর ভাব-কল্পনার সংস্কার এবং তাই সে তার যতটা দরকার মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। কেবল চিত্রশিল্পীর বেলায় যে একথা খাটে তা নয়, সকল কলার বেলায় একথা খাটে।

এখন কথা হচ্চে, ভাব-পরিকল্পনায় অভাব হয় কেন? যেখানে কলাকৌশলের (technique এর) বাড়াবাড়ি সেখানে মন অবসন্ন

গ্রহণ করে; যন্ত্রীর শিক্ষানিয়মের হাত সাজসরঞ্জাম নিয়ে সাজিয়ে তোলে, ফলে কলের মত হয় কাজ প্রাণহীন। মনের মধ্যে যদি আমরা ডুব মারি তো দেখব যে সেখানে তিনটি বিশেষ স্তর আছে। একটি অপরটিকে আড়াল করে আছে স্বচ্ছ পর্দ্দায়। আমরা যা প্রতিনিয়ত দেখি বা ভাবি সেটা মনের মধ্যে ছাপ রাখে না কিছুই এবং যা আমরা দেখে বোঝবার চেষ্টা করি এবং তার জন্যে বিশেষভাবে ভাবি সেটা হ'ল মনের সংস্কার ভাব আর আমরা সকল ভাবনার অতীতে সুপ্ত অবস্থায় থাকার কালে জানি না যে সে অবস্থাটা কি, সেই হ'ল মনের প্রসুপ্ত ভাব। এখন চিত্রকলার মধ্যে মানুষ ধরে প্রথম দুটি স্তরের মনের ভাব থেকে সকল জিনিষকে। আদিম মানুষের ভাসা-ভাসা মনের গতি-চিত্র বিষয়-বস্তুর ভাব-প্রকৃতির কতকটা দেখে এবং কতকটা ভাবতেও পারে না। তাই তারা জন্তু জানোয়ার আঁকার কালে অবয়বের রেখাবলীর কতকটা আঁকে আবার কতকটা হয়ত একেবারেই প্রকাশ করতে পারে না। এই অভাবটা বোধ করারও তার প্রয়োজন নেই। কেননা তার রেখাচিত্রে যেটা নেই বা সে দিতে পারেনি সে তার কল্পনার দ্বারা তাতে আরোপ করে সেটিতে দেখে। তার কাছে সেটি হয় সম্পূর্ণ জিনিষ।

এই ভাবের মধ্যে অভাবের প্রয়োজনীয়তার বিষয় আদিম মানুষ জেনে বা ভেবে করেনি। কিন্তু যদি বেশ ভাল করে ভেবে দেখা যায় ত দেখব যে সকল রচনাই অভাবের অন্তস্তল্ থেকে ভাবরূপে গোড়ায় বিকশিত হয়েচে। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেও শূন্য আকাশের মুক্ত অভাবের মধ্যে এই গ্রহ তারকার আবির্ভাব হ'ল। অণুপরমাণুরও আবির্ভাব ভাবনাতীত প্রকারে ঘটেচে। আদিম মনের যে অভাব ভাবদ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল তা তাদের শিক্ষা সংস্কারের অভাবের মধ্যে উদ্ভূত চিত্রকলায় যেমন পাই, তেমনি বিশ্বনিয়ন্তার ভাবই হ'ল বিশ্বসৃষ্টি এবং সেই ভাবই হ'ল আবার বিশ্বনিয়ন্তা নিজে, এমন কথাও কোনো

কোনো দার্শনিকেরা বলে থাকেন। অভাবই নিরাকার; ভাবই সৃষ্টি ও স্রষ্টা। তেমনি জীবনই আকার; মনই নিরাবয়ব। এই নিরাবয়ব মনই কল্পনা করেচে রূপ এবং সেইটি সৃষ্টি করেচে জীবন দিয়ে মানুষে কলার দ্বারা, এমন কথাও বলা যেতে পারে। ভাবরূপ পরিকল্পনায় মানুষের মনে জাগে প্রকৃতি, বিশ্ব ও তার সৃষ্টি-বিস্ময়। এই বিস্ময় থেকেই মানুষের মন চায় জানতে, দেখতে ও ভাবতে, আর চায় তাকে স্বীয় রচনার দ্বারা ধরে রাখতে। এই বিস্ময় কেবলমাত্র কৌতূহল নয়। কৌতূহল ক্ষণস্থায়ী, বিস্ময় মনকে পূর্ণ করে রাখে। প্রথম বিস্ময় জন্মায় শিশুমনে শৈশবেই। বিশেষ যখন সে দেখে বা শোনে যে তার জন্মাবার পূর্ব্বে অনেক কিছু ঘটনা ঘটেচে বা জন্মেচে, তখন তার মন চায় জানতে যে সে তখন ছিল কোথায় এবং কি আকারে; এই বিস্ময় থেকেই দার্শনিকেরা বিশ্বসৃষ্টির কারণকে নির্ণয় করার জন্যে চিন্তাধারায় নানা প্রকার গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েচেন। তেমনি আদিম চিত্রকরেরাও জীবজন্তু শিকার করার কালে তাদের নিজেদের শারীরিক আকারের তুলনায় জীব-জন্তুর আকারের তারতম্য প্রভৃতির মধ্যে যে বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন, তাই দেখতে চেয়েছিলেন। এই বিস্ময় প্রকৃতির অন্তর্গত রূপ এবং তারই মধ্যে মানুষ তাকে ধরতে পেরেচে এবং তার পরিচয় রেখে গেচে চিত্রকলায়। তাই চিত্রকলায় ভাব-রূপ কেবল শরীর অবয়ব বা মাংসপেশীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানুষ পায়নি, পেয়েচে তার বাইরের অভাবের মধ্যে এবং সেই অভাবটাই পূরণ করতে চেয়েচে চিত্রকলার সাহায্যে।

এখন এই অভাবের রূপ ভাবরূপ (abstract) চিত্রকলায় ফোটানো যায় কি করে, এই একটি সমস্যা উপস্থিত হয়েচে। কিন্তু তারও সমাধান করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েচেন অতি আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীরা—গতানুগতিক শিক্ষা সংস্কৃতিগত ধারায় আঁকা ছেড়ে

দিয়ে বিদ্রোহীভাবে **Sur-realist, Futurist** প্রভৃতি ধরণের আঁকার আবির্ভাব করে।

অবশ্য আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কালেই এইরূপ ভাবরূপের পরিকল্পনার প্রচলন ছিল। যেটাকে ইউরোপীয় শিল্প রসিকেরা আমাদের প্রাচীন শিল্পকলার বেলায় অঙ্কন-নিপুণতার অভাব বলেই অভিহিত করেছিলেন এতদিন। কিন্তু যদি ভাল করে দেখা যায় ত আমরা দেখব যে মোহেন-জো-দড়ো ও হারাপ্পা থেকে নিয়ে অশোকের আমলে এবং তারও অনেক শতাব্দির পরে পহ্লবীরাজের আমলে ভাস্কর্য্য কলায় জীবজন্তু খুবই স্বাভাবিকভাবে তাঁরা গড়ে রেখে গেছেন। যদি নৈপুণ্যের অভাব থাকত ত তাঁরা এ বিষয়ে কখনই কৃতকার্য্য হতে পারতেন না। কিন্তু তা ছাড়া আর সব ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলায় ভাবরূপের পরিকল্পনার পরিচয় আমরা প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলায় পাই।

শিল্পের রীতি

শিল্পের ছন্দ

যেমন মাতাপিতা, ভাইভগ্নী,, খুড়ীজ্যাঠাই ও এইরূপ অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত সম্বন্ধরক্ষা দ্বারা সংসার মধুর হয়ে থাকে, তেমনি বস্তুজগতেও তরুলতা, পর্ব্বত প্রান্তর, জলস্থল ইত্যাদি সব জায়গায় এইরূপ একটা আত্মীয় ভাব আছে বলেই আমাদের চোখে এত সুন্দর, এত মধুর লাগে। এই সম্বন্ধ বা মিল বুঝ্‌তে পারে বলেই মানুষ বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ জীব। আদিম যুগে মানুষের মন যখন ভাবের উচ্ছ্বাসের বেগ ধারণ করে থাকতে পারলে না তখনই ত সে ছন্দে কথা ক'য়ে উঠল—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বম্‌……।" অমনি মিশরের পিরামিডে ও বাবিলের মন্দির-গায়ে চিত্র আঁকা শুরু হ'ল রেখা ও রঙের মিলনে।

পাহাড়ের গায়ে, প্রান্তরে আদিম মানুষ যখন কুঁড়ে ঘরগুলি বাঁধলে তখন নৈসর্গিক দৃশ্যের সঙ্গে রেখায় রেখায় এমন মিলে গেল যে সে রকম মিল আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতার যুগে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও কোন ইঞ্জিনিয়ার আজও গড়ে তুলতে পারলে না। এখনকার কালে এই ছন্দ আর মিলের রচনা করেন একমাত্র কবি ও শিল্পী। ভাস্কর ভাস্কর্য্যে, চিত্রকর তাঁর চিত্রে, ক্রমাগত রেখা ও রঙের ছন্দের দ্বারা বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের মনের এমন মিলন-পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে থাকেন যে মানুষ ছবি বা ভাস্কর্য্য দেখলেই আনন্দে বলে ওঠে, "ভারি চমৎকার।" রেখার ও রঙের সামঞ্জস্যের যে রহস্যে চিত্র চমৎকার হয়ে ওঠে সেটি একমাত্র চিত্রকরেরাই বুঝতে পারেন। ভাষা, তাল ও সুরের দ্বারা কবির কাব্যের ছন্দ সহজে ধরা যায়, কিন্তু চিত্রকলায় বস্তু সংস্থাপনের (Composition) ভিতর যে একটা ছাঁদ আছে সেটা প্রকৃতির হুবহু নকল নয়, প্রকৃতিরই বুকের রহস্যের ভিতরকার একটা

মিল থেকে টেনে বার করা জিনিষ, তাই একথা সহজে বোঝা বা বোঝান শক্ত। আমরা সেটিকে জ্যামিতিক উপায়ে যদি বোঝাতে যাই তাহলে সেটি নীরস এবং ভোঁতা হয়ে পড়বে। আসলে 'ছন্দ' সহজ গতি ছাড়া আর কিছু নয়। কোন প্রান্তরের মাঝে নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা ক্রমাগত যাতায়াত করে' যে একটা আঁকা বাঁকা পায়ের দাগে পথ তৈরী করে সেটি সকলেরই ভারি সুন্দর লাগে। সব মানুষের চলার ছন্দ গতির মিলে তৈরী হয়ে উঠেচে বলেই সেটি এত সুন্দর। এরকম পথ সহরের পাকা সড়কের মত ঋজু রেখায় প্রান্তরটিকে বিদীর্ণ করে বিরাজ করে না, তা প্রান্তরের স্বাভাবিক উঁচুনীচুকে বজায় রেখে তার সঙ্গে খাপ খেয়ে একটি সহজ অনায়াস গতিতে তৈরী হয়ে ওঠে।

সমকোণী চতুর্ভুজ আকারের সাইনবোর্ডে যদি কেহ হেলানো অক্ষরে নাম লেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে হেলানো অক্ষরটি ঠিক চতুষ্কোণের ঋজু ভাবের মাঝে এমন বেমানান হয়ে বেঁকে বসেচে যে তার প্রতি অবাধ্য শিশুর মতই রাগ ধরে। তখন ইচ্ছা করে, তাকে চতুষ্কোণের মাঝে ঘাড় ধরে সোজাসুজি বসিয়ে দিয়ে মানানসই করে তুলি। তেমনি একটি বরফির ধরণের তক্তায় যদি আবার সোজা সোজা ছাপার অক্ষরের মত কিছু লেখা যায়, তাহলে তখন সেটাকে যতক্ষণ সেই বরফি আকারের তক্তায় বাহুরেখার মাঝে তারই মত বেঁকিয়ে বসান না যায়, ততক্ষণ আর তার নিস্তার নেই। সাইনবোর্ডটির আকার চতুষ্কোণ বা বরফি যেমনই হোক তার বাহুরেখার সঙ্গে খাপ খাইয়ে না লিখলে কখনই লেখাটি শোভন হয়ে ওঠে না। এটা সহজেই পরীক্ষা করা যেতে পারে। ছন্দ রক্ষা না করার কুশ্রীতার এটা একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ নয় কি? ছন্দ রক্ষার জন্যে এই অনায়াস বেগ বা সহজ গতি সকল মানুষের মনের মধ্যে আছে তবে সেটিকে শিল্পকলায় গেঁথে তোলে এমন লোকই অল্প। দেখা যায় সহরে যেখানে অসংখ্য লোকের বাস সেখানেও প্রতিদিনের মানুষের চলাফেরার ভিতরও এই স্বাভাবিক মিল

ফুটে ওঠে। এমন কি যখন দেখি সহরে হয়ত একটা দ্রুতগামী মোটর গাড়ীর সম্মুখে একটি লোক রাস্তা পার হতে গিয়ে এসে পড়ে তখন সহজ গতির টানে সে চাপা পড়বার ভয়ে কিছুতেই পেছু হটে যেতে পারে না, সে ছিটকে এগিয়েই পড়ে। এই এগিয়ে পড়াই হচ্চে প্রকৃতির সঙ্গে মিল রাখা এবং সহজগতি।

নদীর উপর দিয়ে যখন বকের বা হাঁসের সার ওড়ে তখন তারা নদীর জলের ও চরের আঁকাবাঁকা গতির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে একটা ছন্দ বজায় রেখে নানান ভঙ্গীতে সারে সারে উড়ে চলে। কতকগুলি গাছ যখন একত্রে জন্মায় তখন দেখতে পাই গাছগুলির ডালপালা, গুঁড়ি প্রভৃতি সব জিনিষের ভিতরই এমন একটা পরস্পর মিল আছে যেটা তাদের নিজেদের সহজ গতিতে তৈরী হয়ে উঠেচে। গাছেরা তাপ ও আলোর অনুকূলে ডালপালা প্রসারণ করে, উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ এই রকম কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ হয়ত দেখাবেন কিন্তু কবি বা শিল্পীর চোখে এই ছন্দ, সৃষ্টি-ছন্দেরই একটি রূপ ছাড়া আর কিছু বলেই মনে হবে না।

চিত্রকলায় বাহ্যরেখার (outline) দ্বারাই প্রধানতঃ ছন্দের বিচার করা হয় কিন্তু এই বাহ্যরেখা ঋজুরেখা (straight line) নয়, কুটিলরেখা (curve line), কুটিল রেখাকে রূপ রেখা বলা যেতে পারে। রেখার ছাঁদ বিধাতার সৃষ্টির ভিতর এইরূপ কুটিল রেখাতেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানুষের যত কিছু স্থূল রচনার কলকারখানা, চৌকাট জান্‌লা, কোটাভিটা প্রভৃতিতে কেবল ঋজুরেখা দেখা যায়—কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিতে সবই রূপরেখা। জীবজন্তু, স্থাবরজঙ্গম, প্রভৃতি জগতের সমস্ত পদার্থের গড়ন খুঁটিনাটি ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক পদার্থই এই রূপরেখায় প্রাণময় হয়ে আছে। মানুষের দেহের প্রত্যেক অঙ্গ অপর অঙ্গের সঙ্গে মিল আছে বলেই তা এত সুন্দর। ডান হাত বাঁ হাতের সঙ্গে ডান পা বাঁ পায়ের সঙ্গে একপাশের

মুখ আর একপাশের মুখের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আছে ; যদি হঠাৎ কোথাও অমিল ঘটে তাহলে সেটাকে রোগ বলতে হয়, সেখানে সৌন্দর্য্য থাকে না। আমরা যদি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারতুম তাহলে দেখান যেত যে জীবজগৎ এবং বস্তুজগৎ সবই রেখাগত সামঞ্জস্য রাখবার দিকেই চলচে। জাপানী চিত্রকরেরা দুটি অর্দ্ধবৃত্তাকার রেখা পরস্পর বিপরীত দিকে যোজনা করে গাছের স্বাভাবিক গতি বা ভঙ্গীর রূপ দেখিয়ে থাকেন। আমরাও ঠিক ঐ একই উপায়ে দুটি অর্দ্ধবৃত্তাকার রেখার ভঙ্গীর সাহায্যে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনের চিত্র এঁকে দেখাতে পারি।

যেখানে শিল্পী আকাশের মত বিপুল শূন্যের গভীরতাকে আঁকবার চেষ্টা করেচেন সেখানেও তাঁকে এই রূপরেখায় বাঁকা লাইনে আঁকতে হয়েচে। ঋজুরেখায় নভমণ্ডলের শূন্যতা কিছুতেই দেখানো যেতে পারে না। শিল্পীরা যখন গাছপালার সঙ্গে মানুষ বা জীবজন্তু আঁকেন তখন গাছপালার সঙ্গে মিল রেখেই তাঁদের সেগুলিকে আঁকতে হয়। যেখানে এই সদ্ভাবের অভাব সেইখানেই বিরোধ সেইখানেই ছন্দপতন অবশ্যম্ভাবী। বিধাতার সৃষ্টির ভিতর যদি এই বাঁকা রূপরেখাটি না থাক্‌তো তা হলে সব জিনিষই ঋজুরেখা ধারণ করে জ্যামিতিক বিভীষিকা দেখাতো, তখন সৃষ্টির এত বৈচিত্র্য কিছুতেই থাকতে পারতো না।

আধুনিক শিল্পে বিশেষত স্থাপত্যে কখন কখন ঋজুরেখার বাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু যেখানে এর খুব বাড়াবাড়ি হয়েচে সেখানেই মানুষ সেই অসামঞ্জস্যকে চাপা দেবার জন্যে গাছপালার ঋজুরেখাকে ঢেকে শোভন করে তোলবার চেষ্টা করেচে। ইউরোপীয় স্থাপত্যে এই কারণেই "আইভি লতা" প্রভৃতির এত বাহুল্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের স্থাপত্যে "আইভি লতা" নেই সত্য কিন্তু লতাপাতার আলঙ্কারিক কারুকার্য্য আছে। এতেই স্থাপত্যের স্থূল ভাব ঢাকা পড়েচে। এই

অলঙ্কাররীতি নানাভাবে শিল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বিগ্রহ মাত্রকেই নানান ভঙ্গীতে ভাঙ্গা হয়েচে। অনন্তনীল নিরাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাধার (প্রকৃতির) পাশে ত্রিভঙ্গ করে দেখানো হয়েচে। এটাতেও কি ছন্দের বা রূপরেখার কথারই সার পাওয়া যায় না? ভারতের প্রাচীনচিত্রে এবং ভাস্কর্য্যে লীলাললিত রেখা ভঙ্গীই বিশেষ একটা আলঙ্কারিক ভাব দিয়েচে।

চিত্রকলা এইরকম যখন সহজগতিতে অনায়াসে ফুটে ওঠে তখন সেটিকে ক্যামেরা বা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে যেমন ভাবেই বাড়ান বা কমান যাক না কেন তার সৌন্দর্য্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, এটি হল তার একটি পরখ। ছোট কিম্বা বড় হওয়াটা ছবির বিশেষ দোষ বা গুণ নয়—ছবিটির রেখা ও রঙের মধ্যে সামঞ্জস্য সহজভাবে বজায় আছে কিনা সেইটেই দেখবার বিষয়। শিল্পীর তুলিকার টান অজ্ঞাতসারে এই সম্বন্ধকে বজায় রেখে চলে, তাঁর সে জন্যে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

ছবির মধ্যে দুটো জিনিষ তার ছন্দের সহায়তা করে একটি ব্যবধান (space) অপরটি বস্তু (object)। এই দুইটিই ছবির বাঁধন। একটি ছোট ছবিতে যথাযথভাবে ব্যবধানের মধ্যে বস্তুসংস্থাপন করলে ছবিটি দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ হলেও তার ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। যে সব ছবিতে ব্যবধানটা বস্তু অপেক্ষা বেশী রাখা হয় সেগুলি বড় করে আঁকা হোক বা না হোক তাদের ভিতর দূরত্বের ভাব বেশী থাকে সেই জন্যই সেগুলিকে বড় ছবি বলা যেতে পারে। আবার যদি কোনও বড় আকারে আঁকা ছবিতে ব্যবধান কম রেখে বস্তুর ভাগটা বেশী করে দেখান হয় সেখানে ছবির প্রসার বা দূরত্বের ভাব কমে যায়। তখন তাকে ছোট ছবির কোঠায় ফেলতে হয়। এ বিষয়টি চিত্রের দ্বারা না বোঝালে কথার দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

চিত্রের ছন্দ বা সহজগতির যেমন প্রয়োজন তাতে রঙের সামঞ্জস্যও

ঠিক সেইরূপই দরকার। গীতিকাব্য যেমন সুর-যোজনায় বিশেষ রূপ পায় ছবিও তেমনি রঙের মিলনে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। গাছের শোভা যেমন ফুল, নারীর শোভা যেমন চুল, ছবিতে রঙেরও ঠিক সেই রকম সার্থকতা আছে, কোন রঙটি কোন রঙের সঙ্গে মেলে কোন রঙটি কোন রঙের বিরোধী এইরূপ সূক্ষ্ম বিষয় শিল্পীরা সহজেই বুঝতে ও আয়ত্ব করতে পারেন অভিজ্ঞতার দ্বারা। শিল্পকলায় এবং কাব্যে ছন্দই প্রাণ। এটা না থাকলে কোন কিছুই গড়ে উঠতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে এই সহজ গুণ্তিটিকে প্রতিপদে খর্ব্ব করা হচ্চে, সেইজন্যেই সবদিকে এত বিরোধ, তাই কাব্যকলা এখনকার দিনের শিক্ষিতদের কাছে ছেলেখেলা।

দ্বন্দ্ব ও ছন্দ

চিত্রকলায় আমাদের মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যে ছবিটা পান্‌সে বা ফিকে, অর্থাৎ আ-লোনা রান্নার মত। যদি তার সঠিক কারণ নির্দ্ধারণ করতে হয় তখন যদি ছবির বর্ণ-বিন্যাসের মিলই (ছন্দই) কেবল দেখি তো দেখব যে ছবিটাকে রঙের মিলে অর্থাৎ s mi tone এ আঁকা হয়েচে—তার বিশেষ বর্ণ সমাবেশটি ফোটাতে হলে তার বিপরীত ভাবের জোর রঙ কোথাও পড়েনি। এই বিপরীত জোর রঙই হল দ্বন্দ্ব (contrast)। আমরা বিধাতার সৃষ্ট এই জগতে অহরহ দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই এইরূপে। আলো ফোটাতে হলে আঁধার চাই এবং আঁধার আলোর পাশেই ফোটে—এটা ত একটি 'ক' 'খ' 'গ'। আমাদের দৃষ্টিতেও যেখানে আলো পড়চে তারই পাশে আঁধার প'ড়ে তবে সেটা স্পষ্টতর হয়। তাই রঙের বেলায়ও শিল্পীদের সেই Contrast টাকে কাজে লাগাতে হয়।

ইউরোপীয় শিল্পীরা এই দ্বন্দ্বের বিশেষ রূপটি দেখেন না—দেখেন প্রকৃতিতে যে কারণে এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় সেই বৈজ্ঞানিক কারণটিকে। তারা তাই কোথা থেকে সূর্য্যোদয় হচ্চে কোন্ দিকে আলো সেই কারণে পড়চে এবং কোন দিকটায় ছায়াপাত হবে তারই অঙ্ক কসে থাকেন মনে মনে ছবি আঁকার সময়। ভারতীয় কলাবিদেরা তার খালি সংজ্ঞাটুকু মাত্র জেনে নিয়েচেন এবং তাঁদের চিত্রের বিষয়টিকে ফোটাবার জন্যে ইচ্ছামত অদল বদল এমনকি ছন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বও জুড়ে দেন। এইখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের বিশেষ তফাৎ। চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ বহুযুগ থেকে এই কলাবিদ্যাকে তার বিশেষ একটি স্থানে রেখে তারই সাধনা বারবার ক'রে এসেচে। তাদের শিল্পকলা প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণের ফলে হয়নি—বিশেষ বিচার, গবেষণা ও সাধনার ফল-প্রসূত।

কবি বর্ণনা করেছেন যে একটি লোক রাত্রের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে মশাল জ্বালিয়ে চলেচে—দীর্ঘরাত্র চলার পর হঠাৎ আকাশের কাল আঁধারের আঁচল চিরে সূর্য্যোদয় হয়ে উঠ্‌ল—আর পথিকের হাত থেকে মশালটিও খসে পড়লো। এখানে এই রাত্রের অন্ধকার ভেদ করে আলোর উজ্জ্বল রঙের দ্বন্দ্ব, তার অপর সব ছন্দকে আরো বেশী করে ফুটিয়ে তুল্‌লে।

ছন্দ (মিল) = আনন্দ ও প্রীতি। দ্বন্দ্ব, (গরমিল) = উচ্ছৃঙ্খল ও বিস্ময়। মায়ের কোলে কচি শিশু বেশ আরামে আছে কিন্তু হঠাৎ মাঝে মাঝে অকারণ বিস্ময়ে চম্‌কে উঠ্‌চে—পাখীগুলি আপন মনে খেলা করতে করতে হঠাৎ ভীত চকিত হয়ে উড়ে পালাল। এই সব বিপরীত movements একদিকে ছন্দ ভঙ্গ করচে, আবার আর একদিকে ঠিক্‌ প্রয়োজন মত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ক'রে ছন্দটিকে মধুময় করে তুলচে। শিল্পীর কাজ এইটিকে যথাযথ ভাবে ধরা। চিত্রে দেখাবার বিষয়ের মধ্যে, বর্ণ-বিন্যাস ও রেখা-বিন্যাসের এই ছন্দ ও দ্বন্দ্বের খেলা শিল্পী দেখাতে যাচ্ছেন। কাঁটাও চাই গোলাপও চাই—এই যে বিচিত্র জগতের মাঝে দোটানা ভাব চলচে তারই রস শিল্পী তাঁর কলায়, কবি তাঁর কাব্য রচনায় অহরহ ফোটাবার চেষ্টা করচেন।

ঘুমন্ত রাজপুরী, সেখানে সবাই আরামে সোনার পালঙ্কে শুয়ে—কোথাও টু শব্দটি নেই—আকাশে চাঁদ সুধা বর্ষণ করচে এমন সময় হঠাৎ বিকট চীৎকার করতে করতে হাঁউ মাঁউ খাঁউ ক'রে এক দৈত্য এসে এক সোনার কাঠির ঘা যেই দিলে অমনি সবাই জেগে উঠ্‌ল, আর কোলাহল সুরু হ'য়ে গেল—এই হ'ল উপকথার মধ্যে সেই দৈত্যের আসল কাজ—সমস্ত সুপ্তি ও আরামের চাবিটাকে দ্বন্দ্বের দ্বারা ফুটিয়ে তোলে এখানে এই দৈত্যের আমদানী না ক'রে ঘুমের পরীর আমদানী করলে কখনই এমন চিত্রটি আমাদের মনকে ধাক্কা দিত না; এটা কতকটা নদীর পাড় ভাঙ্গা আবার পাড় গড়ার বা—দুঃখ ও সুখের

মতই আমাদের মনকে নাড়াচাড়া দেয়। আমাদের প্রাচীন চিত্র-শিল্পীরা-অজন্তা, বাগ প্রভৃতির চিত্রে এই বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিচয় অনেক দিয়েছেন। বাগ প্রাকার-চিত্রের একদিকে একটি রাণীর সকরুণ ক্রন্দনের দৃশ্য, আবার তারই পাশে উদ্দাম নৃত্যগীত ও ঘোড়া হাতী লোক লস্করের মিছিলের ছবি একই জায়গাই এঁকেছে। এতে ছবিটির মধ্যে করুণ রসটি আরো বেশী ফুটে উঠেচে। অজন্তায়ও সেইরূপ দেখেচি যেখানে বুদ্ধদেবের কাছে সব ভক্তমণ্ডলী এবং ভিক্ষুরা বসে উপদেশ শুনচেন আঁকা আছে আবার তারই ঠিক পাশাপাশি বিলাসের চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাজার অন্দর মহলের ছবি সুচারুরূপে ফোটানো আছে। গুহাভিত্তি চিত্রে এক একটি বিষয় স্বতন্ত্র ভাবে আঁকা হলেও পাশাপাশি একই দেয়ালে একটি বৃহৎ ছবি হিসাবে আঁকা—তাই এই দ্বন্দ্বের মাধুর্য্য আরো বেশী প্রকট হয়েচে। এইরূপ চীন ও জাপানের চিত্রকলায়ও দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জাপানী বসন্ত কালের একটি ছবিতে একদিকে চেরী ফুল ফুটেচে সবাই আনন্দ-উৎসব করচে, আর তার চলন্ত ঘোড়ার খুরের উপরে ভ্রমন্ত ভ্রমর গুঞ্জন করচে; হেনকালে ঝড়ের বেগে এক অশ্বারোহী ছুটে এল যুদ্ধ ঘোষণা করতে, এইভাবে বীরত্বকে এই বসন্তের তরল ভাবটি অবলম্বন করে আরো ফুটিয়ে তুলেচে। একটি যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্রে মারামারি কাটাকাটি চলচে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েচে, সামুরাইয়েরা বিকট মুখোস পরে খাঁড়া হাতে আস্ফালন করচে, মাটিতে রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্চে এদিকে দেখা গেল আকাশে পরম শান্তি বিরাজ করচে—একটি চাঁদ স্থির হ'য়ে আলো দিচ্চে—কোনো চঞ্চলতার রেশ-মাত্র নেই! ভাবপ্রকাশে দ্বন্দ্ব এইভাবে শিল্প-কলার সহায়তা করে।

দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে শিল্পী এই contrast প্রতিনিয়ত দেখতে পান এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্রের বিষয় নির্ব্বাচন করেন। শিল্পী দেখাচ্চেন একটি ছবি যা প্রতিনিয়তই সবাই দেখে থাকে কিন্তু

তারই ভিতর ছন্দ ও দ্বন্দ্বের সমন্বয় ক'রে তিনি আরো অনেক কিছু ভাবের স্থষ্টি করে দেন। যেমন কোনো একজন শিল্পী একটি পল্লীলক্ষ্মীর ছবি আঁকলেন ;—আঁকলেন গ্রাম্য বধূটি নদীর বাঁধা ঘাটে কলসী নিয়ে জল আনতে গেলেন, জলে দেখলেন পদ্মফুল ফুটে আছে—তাঁর জলের কলসীতে জল ভরা রইল পড়ে, তিনি চললেন পদ্মফুল তুলতে। এই কাজ করার সঙ্গে অকাজ করার দ্বন্দ্বটাতে শিল্পী যে কত কথাই ফুটিয়ে তুললেন তা' রসজ্ঞমাত্রেই বুঝতে পারবেন। আর এক ছবিতে কোনো গাঁয়ের মেয়ে ঝুড়ি মাথায় তেলের ভাঁড়, নুনের ভাঁড় নিয়ে হাটে যাচ্চিলেন—হঠাৎ একটি গাছের ধারে কোনো এক রাখালের বাঁশী শুনে থম্‌কিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন—তার আর হাটে যাওয়া হল না।—এই যে ছবির মধ্যে বিপরীত ভাবের সমন্বয় এনে দিলে এটাও ছন্দজ্ঞ ও দ্বন্দ্বজ্ঞ শিল্পীরই কারুকার্য্যের পরিচয়।

রঙের ব্যঞ্জনায়ও ঠিক এই কথাই খাটে। রঙের মধ্যে দুটো জাত আছে। একটি চড়া বা কড়া রঙ আর একটি মিঠে বা নরম রঙ। নরম রঙের মর্য্যাদা চড়া রঙ না দিলে রাখা যায় না—একথা শিল্পীমাত্রেরই জানার কথা। Colour contrast প্রকৃতির মধ্যে আমরা সব সময়ই দেখতে পাচ্চি। এই সবুজ ঘাসের মধ্যে যেমন নীল, হলুদ রঙের ফুলের সমাবেশ দেখি, আবার কালো মাটির উপরে কত রকমের পাতার গাছ ও আগাছা—একেবারে প্রত্যেকটি বিপরীত রঙ নিয়ে প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে প্রকাশ হয়ে আছে। নীল আকাশের উপর সবুজ গাছ ডালপালা প্রসার ক'রে বর্ত্তমান। এইভাবে কড়ি ও কোমলের সুর সর্ব্বত্র ধ্বনিত হচ্চে—যে ওস্তাদ, সেই সে সুরটির সন্ধান পায় এবং তারই সুরে সুর মিলিয়ে আপনার বীণায় সুর বাঁধে। কোমলের পর্দ্দায় কেবল হাত চল্‌লে যে সুরের অপব্যবহারই হয় তা' তাঁর জানা আছে। তবে কেবল ঝঙ্কার যেমন চলেনা, মীড়ের প্রয়োজন, তেমনি দ্বন্দ্বের সার্থকতা ছন্দকে যখন সে পুষ্ট করবার জন্যে প্রয়োজনমত দেখা দেয়।

রঙের ও মিঠেকড়া সুরটির উপযুক্ত সমাবেশেই শিল্পীর ছবিখানি ফুটে ওঠে। যেখানে একটানা কড়া বা চড়া রঙ বা যেখানে কেবলই মিঠে রঙ সেটা নুন-ঝালবিহীন তরকারীর মতই বিস্বাদ।

তবে রেখা-বিন্যাসের মধ্যে একটা কথা এই আছে যে কেবল যখন কোনো সজ্জা-চিত্র (decorative painting) আঁকবার প্রয়োজন হয় তখন কেবল মিলের বাহার, ছন্দের বাহার প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু ছবিতে কেবল একই রেখার প্যাঁচে মণ্ডন-চিত্র দেখালে কখনই ঠিক সুরটি ফুটে ওঠে না। মণ্ডন-চিত্রে (decorative designএ) রেখাগুলি patternএর মত—তার প্রাণশক্তি নেই;—তাকে কেবলই দেখতে হয় বাইরের সৌন্দর্য্যের দিকে, ভাবের দিকে তার কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু যখন কেবল বাঁকা রেখা একভাবে একই দিকে ক্রমাগত চলতে থাকে, ছবির মধ্যে তখন তার গতিটিকে রোধ করার জন্যে কখন কখন বিরূপ ঋজু-রেখারও প্রয়োজন হয়ে থাকে। প্রকৃতির দৃশ্যের মধ্যে কখন কখন যখন তরঙ্গায়িত মাঠের সঙ্গে সারিবদ্ধ দিগন্তরালের গাছগুলি এবং পল্লীগ্রামের চালাঘরগুলির স্বচ্ছন্দ-সমাবেশ দেখতে পাই এবং যখন তারই ভিতর ঋজু-রেখায় মাথা উঁচু ক'রে সবাইয়ের বিপক্ষে তাল ঠুকে কোনো একটি তালগাছকে মাথা তুলতে দেখা যায়—তখন আর দ্বন্দ্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না।

রেখার মধ্যে গতি আর স্থিতি ছন্দ ও দ্বন্দ্বের স্থান গ্রহণ করেচে। গতিতে আনন্দ,—স্থিতিতে মৃত্যু। কিন্তু শিল্পকলায় শিল্পীর আনন্দকে ফোটাতে গেলে স্থিতির বিভীষিকা দেখানরও সময় সময় প্রয়োজন হয়। এই দ্বন্দ্বের ও ছন্দের সমন্বয় শিল্পীরা চিরকাল করার চেষ্টা করচেন। এর কোথাও শেষ সীমা টানা যায় না। তাই এত বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হচ্চে। তা' না-হ'লে যদি রেখা বা রঙের সমাবেশ অঙ্কশাস্ত্রের মত একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞায় গিয়ে পৌঁছুত, তাহলে

আর নতুন কিছু শিল্পীরা গড়তে পারতেন না। এইখানেই বিজ্ঞানকে শিল্পকলা ছাড়িয়ে উঠেচে। বিজ্ঞান ঠিকমত উভয়বস্তুর মিলন জাজ্বল্য-ভাবে প্রমাণ করে দেখিয়ে একটা কিনারা ক'রে দেয়। কিন্তু শিল্পী দ্বন্দ্বের মধ্যে এই মিলের সুর বাজিয়ে তোলেন।

চিত্রের রেখাকে অনেকে গণ্ডি ব'লে মনে করেন। কিন্তু আসলে এই রেখা চিত্র-কলার রূপ প্রকাশের বাহ্যপ্রকাশ হ'তে পারে কিন্তু রসপ্রকাশের পক্ষে সেটাকে ডিঙিয়েও বহুদূরে ছুটে চলে তার ভাব—এইজন্যই তার এত খাতির। রেখার মধ্যে ঋজু ও গোল রেখাকে অনেকে বড় ছবিতে সহজে ঘেঁসতে দেন না—কেননা তারা বড়ই একঘেঁয়ে একগুঁয়ে কিন্তু এমন সময়ও আসে যখন তাদের সাদরে বরণ ক'রে নিতে হয়—অবশ্য দ্বন্দ্বের মধ্যে ছন্দ আনার জন্যে।

ভাব ও অভাব সংসারে যেমন দুটোই সুস্পষ্ট, চিত্রকলায়ও ছন্দ ও দ্বন্দ্বের অধিষ্ঠান তেমনি। "আদায়-কাঁচকলায়" একটা কথা আছে বটে, কিন্তু নিপুণ পাচকের হাতে পড়লে যে বেশ সুস্বাদু না হয় তা' বলতে পারা যায় না। তবে শিল্পকলায় শিল্পীরা সেই নিপুণতারই পরিচয় দিয়ে থাকেন ছন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সমন্বয় ক'রে।

চিত্রকলায় স্থাপত্যরীতি

আকবরশার স্থাপত্যকলার প্রতি অনুরাগের পরিচয় ফতেপুরের প্রাসাদ প্রভৃতিতে আমরা পাই। তাঁর মনে স্থাপত্যকলার কোনো একটি বিশেষ ছন্দ-রস জাগত বলেই তাঁর তাতে এত অনুরাগ দেখা দিয়েছিল। এই বিশেষ ছন্দ-রসকে ধরতে হ'লে বস্তুশিল্পের মধ্যে মানুষের মনের পরিচয় যে-দুটি স্তরে নিহিত থাকে তার কথা বলা দরকার। একটি তার বাসোপযোগীতায় এবং অপরটি সৌন্দর্য্য-সুঠামে ধরা যায়। এই দুয়ের সমন্বয়ে স্থাপত্যের রূপ গড়ে ওঠে ঋজু কোমল দ্বন্দ্ব ও ছন্দের দুই ভাবে।

স্থাপত্যকলা রীতিপদ্ধতির আলোচনা করলে দেখা যায় যে তার সৌন্দর্য্যের প্রধান রূপটিকে তিনটি বিশেষ রেখার দ্বারা স্থপতিরা আমাদের দেশে ধরেছেন, আর চলতি কথায় নাম দিয়েছেন 'গালা' 'গালতা', 'চিনী'। গালা—নতোদর (Concave); গালতা = উন্নতোদর (Convex) এবং চিনা = ঋজুরেখা (Straight line)। এই তিনটি রেখা-উপকরণে স্থাপত্যের প্রকাশ। একটি অর্দ্ধবৃত্ত রেখার মাথার উপর উল্টো ক'রে অপর একটি অর্দ্ধবৃত্ত রেখাকে সাজিয়ে ধরলে যা' হয় এবং তার উপর একটি ঋজুরেখা টানলে এর সত্য নিরূপিত হয়। সকল স্থাপত্যকলার মধ্যে এই রেখাগুলি সাজানোর তারতম্য লক্ষিত হয়। চিত্রকলার বেলায় গালা ও গালতা (Concave and Convex) এই দুই রেখার খেলা যা' প্রকৃতির ভিতর পাওয়া যায় তারই লীলা চলে মুখ্যতঃ এবং গৌণভাবে ঋজু রেখার দ্বন্দ্ব এই লীলা-ছন্দ বা মিলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। এই বিষয়টি দুঃখের বিষয় চিত্রে না-এঁকে ভাষায় বর্ণন দ্বারা বোঝানো যায় না। একটি তৃণ আঁকবার কালেও এই দুই

বিপরীতভাবে সজ্জিত বৃত্তার্দ্ধ-রেখার খেলা দেখাতে হয় চিত্রকরকে; আবার মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, রেখা-ভঙ্গীর মধ্যেও তারই ইসারা জাজ্বল্যমান থাকে। এই গালা-গালতা আঁকা-বাঁকার খেলা প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে আছে—আকাশে গ্রহনক্ষত্র গাছপালার মধ্যে, স্থাবরজঙ্গম সকলের মধ্যে। আর মানুষ যা রচনা করে যান্ত্রিক জিনিষ তার মধ্যে মুখ্যত থাকে 'চিনী'—বা ঋজুরেখা। তাই অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের ঘরবাড়ীগুলি ঋজুরেখার ভাবে এমন দাঁড়াতে আরম্ভ করেচে যে প্রকৃতির ভিতরকার ছন্দ ভাবটিকে পর্য্যন্ত নষ্ট করতে বসেচে। আধুনিক আমেরিকার বাক্সর মত গাঁথা গগনভেদী হর্ম্ম্যগুলি এবিষয় সাক্ষ্য দেয়। স্থাপত্যে যেমন ছন্দ চাই তেমনি দ্বন্দ্বের জন্য ঋজুরেখারও প্রয়োজন সমষ্টিগত ছন্দের সুরে বাঁধতে গেলে (Harmonyর জন্য) এবং ছন্দসমবায়ের (Compositionএর) বেলায়।

শিশুরা তাদের অচেতন সংজ্ঞার দ্বারা যা-কিছু দেখে, তার আকারের সবটা মনে রাখতে পারে না। তাই তারা যখন কোনো জিনিষ আঁকতে যায় তখন তার একটি সংক্ষিপ্ত আকার মাত্র গড়ে তোলে—বাকি সবটা তার মনের মধ্যে কল্পনালোকেই থেকে যায়। শিশুদের আঁকা কাজের ঐক্যের কারণই এই, এবং সেই জন্যে একঘেঁয়ে দেখতে হওয়ায় তাকে ছেলেমানুষি কোঠায় না ফেলে আর উপায় নেই। অবশ্য এইরূপ আকার-সংক্ষেপ করার প্রথা আমরা জানতে পারি মণ্ডন চিত্রাবলীর (decorative artএর) ভিতর, যা' আসবাবপত্রের অলঙ্কার স্বরূপে কাজে আসে। এই শিশুদের শিল্পের মধ্যে ছন্দের তরঙ্গ-খেলা নেই এবং এই—আলঙ্কারিক শিল্পের সবটাই গালা-গালতার ওঠা পড়ার নৃত্যতানে মুখরিত। এই গালা-গালতা ছন্দদোলার গূঢ়রহস্যকে ধরেছিলেন

ভারতের প্রাচীন শিল্পীরা। তাই তাঁদের ভাস্কর্য্য চিত্রের ভিতর তরঙ্গ-ছন্দ ওঠাপড়া ভাবে আন্দোলিত ক'রে তুলেছিল বৌদ্ধযুগে সারা এসিয়া খণ্ডকে। ভাস্কর্য্য-চিত্রে ও চিত্রপটে মানুষের মূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূর্ত্তিগুলিকে মালাহারের মত গেঁথে রেখে গেছেন এই একই গালা-গালতার ছন্দ-দোলায়। যবদ্বীপে বরবুদরের ভিত্তিচিত্রে, কাম্বোজে ওঁকার মন্দিরে, চীনে সহস্র বুদ্ধ মন্দিরে এবং জাপানে হোরিওজি ও কংগোভুজির মন্দিরে এই রেখালীলার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইউরোপের চিত্রকলার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার তুলনা করলে এই ছন্দগত বিশেষত্বের বিষয় স্পষ্ট বুঝা যায়। ইউরোপের চিত্রকলার রেখাভঙ্গীগুলিতে গতিছন্দের (dynamic) ভাব প্রতিহত। শিল্পসৃষ্টির সমষ্টিগত চেষ্টার বেলায় খুবই প্রগতিশীল কিন্তু রেখা-ছন্দের প্রক্রিয়ার বেলায় সে কথা খাটে না। ইউরোপের শিল্পীরা প্রকৃতির আকারের মধ্যে যে রেখার বিশেষ একটি ছন্দ-ছাঁদ ফুটে আছে তা দেখেননি, অথচ সূক্ষ্মভাবে প্রকৃতির খুব নিকটে গিয়ে তাকে দেখার ও ধরার চেষ্টা করেচেন। তার অন্তরের দিকে রেখাতরঙ্গের মধ্যে যে প্রগতির বাজটি লুকানো আছে তার সন্ধান তাঁরা পাননি। তাই এখন ইউরোপে শিশু-শিল্পের খেলাধুলার ধূলামাটির আসনে তাদের সঙ্গে (sur-realist) শিল্পীরা গিয়ে বসেচেন। আমাদের দেশে বিশ্বসৃষ্টির প্রাণধর্ম্মকে শিল্পীরা ধরেছিলেন এই দুই বিপরীত তরঙ্গ রেখার মধ্যে—গালা ও গালতায়। ভারত-শিল্পের এই তরঙ্গ ভাবটি গতিশীল হওয়ায় বহু যুগ ধরে তার স্পন্দন এশিয়া খণ্ডের নানা দেশে রেখে গিয়েছিল শিল্পকলার ভিতর।

ইউরোপের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তাদের ব্যালে (Ballet) নাচের গতিছন্দটির রূপটিতে। ভারতীয় নৃত্যকলায় অঙ্গ হিন্দোলনের

মধ্যে একটি সমতা বা ঐক্য পাওয়া যায়—অঙ্গ সঞ্চালনের গতিতরঙ্গ গালা-গালতারই খেলা দেখায়। আর ইউরোপীয় 'ব্যালে' (Ballet) নৃত্যে থাকে কোণাদার (angular) সরল-রেখার জোর—যাকে স্থপতির ভাষায় 'চিনী'—(ঋজুরেখা) বলা হয়। এর মধ্যে ইউরোপের যন্ত্র বিজ্ঞানের প্রভাব শিল্পকলায়ও সূচিত হয়। ভারতীয় শিল্পে শিল্পীরা খুঁজে বার করেছেন বিধাতার সৃষ্টির ভিতরকার রেখা-ছন্দের তথ্য এই গালা ও গালতায়—(negative ও posetive এর মধ্যে)। বিশ্বসৃষ্টিতে আকাশ (শূন্য) ও গ্রহতারকার (পূর্ণতা) রূপের মধ্যে বর ও অভয় দুই গালা-গালতার তরঙ্গ ভাব আছে এবং পুরুষ ও প্রকৃতির রূপে এই দুই ভাবকে হিন্দুদর্শনে ধরা হয়েছে। ছন্দ-ধারার এই বিশেষ পরিচয় জানলে ভারতীয় শিল্পের রূপটি সহজে ধরা পড়ে।

প্রকৃতিও একজন বড় শিল্পী, তার মধ্যে গালা-গালতা ভাব ওতপ্রোত আছে। জলের স্রোতের গতি উপলগুলির উপর আহত হয়ে বীচিতরঙ্গের ছন্দরেখা আনে এবং নদীতীরে সৈকতে পাখীর পায়ের দাগগুলির মধ্যে ও মানুষের পায়ে পায়ে চলায় তৈরী মাঠের মাঝখানে সিঁথি-টানা পথের ভিতর বিসর্প ভঙ্গীটিতে এবং আকাশে মেঘের উপর যে সব রূপ-প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় তার বৈচিত্র্যের মধ্যেও গালা-গালতার যোগসূত্রটি ধরা যায়। ছন্দের লীলা-রেখার বরাভয় ভাব এই দুয়েরই প্রতিধ্বনি। এই দুই ভাব চিত্রপটের বস্তু-বিন্যাসের সমবায়-ছন্দে compositionএ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রত্যেক বস্তুর আকারগত ছন্দের মধ্যেও দেখা চাই। প্রকৃতির রূপ সমষ্টিগত ভাবে ও পৃথকভাবে দেখতে গেলে এই ছন্দের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। একটি ঝরণার জলের স্রোতের মুখে পড়ে অসমান নুড়িগুলি যেমন গালা-গালতা ছন্দভাব আনে তেমনি প্রত্যেক নুড়িটিতেও সেই ভাব বর্ত্তমান আছে। ভারতীয়

শিল্পকলার এই ছন্দটিকে অবলম্বন ক'রে সারা এশিয়াখণ্ডের শিল্পকলায় তার প্রভাব বিস্তারলাভ করেছিল।

স্থাপত্যের সঙ্গে চিত্রকলার আরো একটি বিশেষ মিল দেখা যায়, তার স্বাভাবিক পরিস্থিতি ও সংস্কারগত আবহাওয়ার দিকে। স্থাপত্যকলা যেমন মিশর, গথিক, সারাসানিক হিন্দু-বৌদ্ধ, গ্রীক, প্রভৃতি এক একটি দেশের বিশেষ কৃষ্টিগত সাধনাকে ফুটিয়ে তুলেচে, তেমনি চিত্রকলায়ও দেশবিদেশের কৃষ্টিও সংস্কারগত আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হয়। কৃষ্টি-য়ানা বাবুয়ানার মত পরিত্যক্ত বিষয় নয়, এক্ষেত্রে। মোগল আমলে ভারতীয় শিল্পকলাকে অবলম্বন করে তবে সে-যুগের বিশেষত্বকে প্রকট করতে পেরেছিল মোগলেরা; তেমনি বৌদ্ধযুগের কৃষ্টি ও পরবর্ত্তী সকল শিল্পকলাকে প্রাণবান করে তুলেছিল। মোগল আমলে চারুকলায় দ'না-পড়ার কারণই হ'ল বৌদ্ধযুগের শিল্পকলার প্রগতি-ধর্ম্ম। এবিষয় আধুনিক যুগ ভাগ্যবান নয়, কেননা এ যুগে সহসা বিদেশী শিল্পকলার বিশেষত্বকে গ্রহণ করতে গিয়ে দেশের শিল্পকলাকে জারজভাবে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান করারই চেস্টা চলেচে। স্থাপত্যের বনিয়াদ যেমন সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত শিল্পমাত্রেরই, তাই। ভাল স্থপতি হ'তে হ'লে যেমন ভিত্তি স্থাপনার মূল সূত্রটিকে জানতে হয়—শিল্পী হ'তে গেলেও তেমনি সেকথা জানা দরকার।

চিত্রকলার বিষয়

ভারত-চিত্রকলার এই নবজাগরণের যুগে চিত্রকরদের মনে এখন এক প্রশ্নের স্বতই উদয় হ'তে পারে যে, আমরা কেবল পৌরাণিক বা আধুনিক সাহিত্য থেকেই ভাব নিয়ে চিত্র-রচনা করে চলেছি, এতে আমাদের ক্রমাগত কোন-না-কোন প্রাচীন বা আধুনিক ভাবুকের ভাবের দাসত্বই করতে হচ্চে। নিজেদের ভাবের বিকাশ হচ্চে না, এর মুক্তি কোথায় ? এর উত্তরে আমাদের ভাবতে হবে যে কাব্যের মধ্যে যেমন Epic ও Lyric এবং সঙ্গীতের মধ্যে যেমন ধ্রুপদ ও খেয়াল আছে, তেমনি চিত্র-কলার মধ্যেও দুইটি প্রধান বিষয় আছে। এদের মধ্যে একটি কৃষ্টিগত (Traditional) পৌরাণিক ভাব অবলম্বনে প্রকাশ পায়, অপরটি প্রত্যেক শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাবের অভিব্যক্তিতে মুক্তি পায়। জাতীয় ভাবের প্রাচীন পৌরাণিক গল্প ও ইতিহাস থেকে কাব্যে যেমন Epic এর জন্ম, এবং সঙ্গীতে প্রাচীন ভাবের সুরযোজনার স্বার্থকতায় যেমন ধ্রুপদের সৃষ্টি, তেমনি আগম বা পৌরাণিক ভাব থেকে এক শ্রেণীর চিত্রকলার উৎপত্তি হয়, তাকে Epic শ্রেণীর চিত্র বলা যেতে পারে। কাব্যে ব্যক্তিগতভাবে খামখেয়ালি কবি যেমন গীতিকবিতা (Lyric) রচনা করেন এবং সঙ্গীতের মধ্যে গায়কেরা যেমন ধ্রুপদের মত প্রাচীনকালের বাঁধা স্বরগ্রামকে অতিক্রম ক'রে খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন, তেমনি চিত্রের Lyric বা খেয়াল হ'ল শিল্পীর ব্যক্তিগত খেয়ালখুসীর আঁকা ছবি।

সাহিত্য ও পুরাণাদি গ্রন্থ শিল্পীদের মনের খোরাক আজও যেমন যোগাচ্চে শত বৎসর পরেও তেমনি যোগাবে। আসল কথা এই যে পুরাণ, প্রাচীন কাব্য ও প্রাচীন চিত্রকলা বা প্রকৃতির ঘটনাবলী থেকে শিল্পীর মনে যদি সত্যই কোন চিত্রের ভাব জেগে ওঠে এবং সেটির

অনুকরণ হুবহু না করে নতুন ক'রে সৃষ্টি করার ইচ্ছা হয় তো সেটি শিল্পীর নিজেরই জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে জিনিষটিকে কাব্যের বা পুরাণের কেবল অনুবৃত্তি (illustration) বলা যায় না তখন সেটি হয়ে দাঁড়ায় শিল্পীর অভিনব সৃষ্টি। এইভাবেই প্রাচীন গ্রীসে ও মিশরে পৌরাণিক দেবদেবী, রাজন্যবর্গ বা যোদ্ধৃবৃন্দের জাদের অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে শত শত ভাস্কর ও চিত্রকর শিল্প-জগতে অনেক অপূর্ব্ব নিদর্শন রেখে গেছেন। আমাদের দেশেও প্রাচীন যুগে এরূপ পৌরাণিক চিত্রাবলীর অনেক নিদর্শন দেখা যায়।

সর্ব্বপ্রথমে (আদিমকালে) মানুষ যা' আঁকত তা' সবই এক-প্রকার খামখেয়ালিতে আঁকা Lyrical চিত্র। তারা তখন পাহাড়ের গুহার গায়ে আসবাবপত্রে বসনভূষণে, নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুতে ছবি আঁকত সেগুলিকে সুন্দর ক'রে তোলবার জন্যে। তার পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে আমাদের দেশে এবং অপর সকল সভ্য দেশে দেখা যায় যে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কোনো-না-কোনো বীরপুরুষ রাজা বা ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েচে এবং তাঁকেই অবলম্বন ক'রে শিল্পকলা জন্মগ্রহণ করেচে। সেই সব মহাপুরুষদের গৌরব-কাহিনী জগতের সামনে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে শিল্পকলাকে আশ্রয় নিতে হয়েচে।

আমাদের দেশের এই মধ্যবর্ত্তী যুগের শিল্পের মধ্যে দেবদেবীর ছবি ছাড়া ছবি আঁকার প্রধান বিষয় হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। তাই ভারতের সবস্থানেই তাঁর ছবির নিদর্শন ভূরি ভূরি আমরা আজ দেখতে পাই। গ্রীস, মিশর ও ইটালিতেও ঠিক তাই দেখা যায়। মধ্যযুগের প্রধান যোদ্ধা ও দেবতাই ছিলেন ঐ সকল দেশের ছবির প্রধান নায়ক। তারপরে খৃষ্টের জন্ম হ'লে তাঁর কাহিনী অবলম্বন ক'রে ইটালীয় চিত্রকলা গড়ে উঠেছিল। আজও জগতের সম্মুখে তার নিদর্শন উজ্জ্বল হয়ে রয়েচে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের শিল্পে হচ্ছে Lyrical এর

বাড়াবাড়ি, কেননা এখন মানুষ চায় তার মনের ভিতরকার সৌন্দর্য্যের বিকাশ চিত্রশিল্পে দেখতে।—তা' ছাড়া আধুনিক শিল্পের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

শিল্পী যদি কাব্য, সঙ্গীত বা পুরাণ থেকে ভাব গ্রহণ করেন তাহলে তাকে সেগুলির দাসত্ব করা হয় এরূপ কথা বলা চলে না। প্রকৃতি থেকে যেমন শিল্পীরা ভাব গ্রহণ করেন কাব্য প্রভৃতি থেকেও তাঁরা সেই সকল ভাবকে নতুন ক'রে ঢেলে সাজিয়ে তুলতে পারেন চিত্রকলায়। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তো কোনো অদ্ভুত কিছু সঙ্কেতের দ্বারা চিত্রকলা হয় না? তেমনি কবিরা কাব্য ও সঙ্গীত প্রভৃতিতে প্রকৃতি থেকে যা রসগ্রহণ ও পরিবেশন করেচেন তার অংশীদার শিল্পীরাইবা হবে না কেন? প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ চিত্রকলায় চলে, কিন্তু কাব্য বা সঙ্গীত থেকেও ভাব পেতে পারেন শিল্পীরা; কিন্তু সেক্ষেত্রে রেখা রঙে সাজিয়ে তুলতে হয় সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন উপায়ে—নতুন করে গড়ে তুলতে হয় একেবারে। নকল করবার এতে কোনোই রাস্তা নেই। প্রকৃতির অনুকরণ হুবহু করাই দোষ কেননা অনুকরণ হ'ল বস্তুর বাইরে থেকে ভোগ করা, অন্তরের সঙ্গে তার যোগ থাকে না। প্রকৃতিগত ভাবকে নিজের মনে নতুন করে গড়ে তোলাই হল অন্তরের ভোগ। প্রকৃতির বাহ্য অনুকরণই হ'ল প্রকৃত দাসত্ব করা। ফুল গাছেই শোভা পায়; কিন্তু ফুলকে আবার প্রয়োজন মত ঘরে সাজিয়ে তুলতে হয় ঘর সাজবার জন্য। এই ঘরে সাজাবার কালে ফুলের নির্ব্বাচন, চয়ন প্রভৃতি না জানা থাকলে সেগুলির অপচয় করা হয় মাত্র। তেমনই মনের মধ্যে আহরণ করে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে চিত্রপটে সাজিয়ে তুলতে না পারলে চিত্রকলা হয় না—সেটা ছেলেখেলা হয় মাত্র। অনুকৃতি ও প্রতিকৃতি সম্বন্ধে পূজনীয় [illegible] ঠাকুর মহাশয় তাঁর "আর্য্যামী ও সাহেবিআনা" প্রবন্ধের একস্থানে বলেচেন—" অনুকরণ যে কাহাকে বলে সে বিষয় এক্ষণে আর অধিক বাক্য ব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা

যাইতেছে না। কিন্তু অনুকরণ যে কাহাকে বলে না সে বিষয়ে বৎকিঞ্চিৎ একটি কথা এখনো আমাদের বলবার আছে—সেটি এই যে আদর্শের প্রতিকৃতি অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে।—মনে কর দুইজন চিত্রকর এক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন, আর মনে কর যে প্রথম চিত্রকর সুন্দর একটি ছবি চিত্রপটে উদ্ভাবন করিয়াছেন। সেই অঙ্কিত চিত্রটি দেখিয়া দ্বিতীয় চিত্রকরের অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্বোধন হইল; তাহার পরে সেই দ্বিতীয় চিত্রকর উদ্বোধিত ভাবটিকে পটে অভিব্যক্তি করিতে গিয়া প্রথম চিত্রটির অবিকল অনুরূপ দ্বিতীয় একটি চিত্র তাঁহার হস্ত দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ স্থলে প্রথম চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি আদর্শ এবং দ্বিতীয়টিকে তাহার প্রতিকৃতি; এ ভিন্ন দ্বিতীয় চিত্রটিকে প্রথম চিত্রের অনুকৃতি বলিতে পারি না। তাহা না বলিতে পারিবার কারণ এই যে প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি চিত্র দুইজনের সমান মনের ভাব হইতে উৎপন্ন হওয়াতেই সমান আকার ধারণ করিয়াছে তা' একটার দেখাদেখি আর একটা তাহার সমান হইয়া উঠে নাই; একটার দেখা দেখি যখন আর একটা জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন কাজেই একটা আর একটার অনুকৃতি হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন যে দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতেই ভাব পাইয়া তবে তো দ্বিতীয় চিত্রটি উৎপাদন করিয়াছেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রের অনুকৃতি নহে? ইহার উত্তর এই যে, লোকে যেমন জলাশয় হইতে জল তুলিয়া কলস পূরণ করে, সেইরূপ করিয়া কেহ কোনো একটি ভাবকে বাহির হইতে লইয়া উঠাইয়া অন্তরে পুরিতে পারে না—কেমন করিয়াই বা পারিবে? ভাব তো আকাশব্যাপী ভৌতিক পদার্থ নহে যে তাহাকে উঠাইয়া আনিতে বা আরেক স্থানে রাখিতে পারা যাইবে? ভাব মানসিক পদার্থ; আকাশের মধ্যে দিয়া মূলেই তাহার চলাচলি সম্ভবে না। অতএব দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতে ভাব লইয়াছেন ইহার অর্থ

এরূপ না যে প্রথম চিত্রটির গায়ে একটি ভাব আটা দিয়া জোড়া ছিল সেখান হইতে তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনার মনের ভিতর পুরিয়াছেন। উহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে প্রথম চিত্রটি দেখিবামাত্র দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি ভাবের উদ্বোধন হইল—বাহির হইতে ভাবের আগমন হইল না, কিন্তু অন্তর হইতে ভাবের আবেগ যাহা তাঁহার অন্তরে প্রসুপ্ত ছিল তাহাই উদ্বোধিত হইল, যাহা মুকুলিত ছিল তাহাই বিকশিত হইল, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই অভিব্যক্তি হইল। কাজেই ভাবগ্রহণ বলিতে বাস্তবিকই কিছু আর বাহির হইতে ভাবগ্রহণ বুঝায় না, প্রত্যুত অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধনই বুঝায়। এইজন্য উদ্বোধিত ভাব হইতে যদি দৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শের অবিকল অনুরূপও একটা প্রতিকৃতি উদ্বোধিত হয় তথাপি তাহা প্রতিকৃতি ভিন্ন অনুকৃতি শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।”

উল্লিখিত অনুকৃতি ও প্রতিকৃতি দুটি বিষয়ের আলোচনায় আমাদের বক্তব্য অনেক স্পষ্টতর করে দিয়েচেন শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। অনেক সময় চিত্রপরিকল্পনা কালে শিল্পীর দেখা বস্তুর ছাপ আপনা থেকেই হুবহু এসে যায়। এরূপ স্থলে দেখা বস্তুর সঙ্গে ছবিটির হুবাহু মিল হলেও সেটি তার প্রতিকৃতি হতে পারে—অনুকৃতি হয় না। প্রতিকৃতি আঁকাই চিত্রকরের কাজ। অনুকৃতি চিত্রকলায় চলে না। প্রতিকৃতির সঙ্গে অনুকৃতির পার্থক্য বোঝা যায় ফোটোগ্রাফের সাহায্যে ছবি তোলা ও চিত্রকরের আঁকা চিত্রের মধ্যে। ক্যামেরা তোলে যা' লেন্সের চোখে প্রতিফলিত হয় সবটাই আর চিত্রকর চিত্রপটে ঢেলে সাজাতে পারেন নিজের ইচ্ছামত বাদসাদ দিয়ে।

পটে চিত্র এঁকে চিত্রকর দেখাকে সুন্দর ক'রে তোলেন রেখা ও রঙের সাহায্যে। এই সুন্দর ক'রে তোলাই হ'ল শিল্পীর উদ্দেশ্য এবং রঙ, রেখা প্রভৃতি হ'ল তার সৌন্দর্য্যের প্রকাশের উপায়। সাধারণের চক্ষে যে সকল জিনিষ ও ঘটনা চোখে প'ড়েও পড়ে না

এই সব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্য থেকে শিল্পী সেই সুন্দরের আভাস ফুটিয়ে তুলতে পারেন। দিনমজুর মাটি কাটে অনেকেই তাকে অস্পৃশ্য ও দরিদ্র বলে মনে স্থান দেন না; কিন্তু একজন শিল্পী সেই দিনমজুরের মাটিকাটার ছাবটিই সকলের সামনে এঁকে ধরে দিয়ে দেখাতে পারেন কত বড় একটা সৌন্দর্য্য তার দৈনিক কর্ম্মে, স্বাস্থ্যে এবং প্রকৃতির সঙ্গে যোগে ফুটে ওঠে। চিত্রকলা বা কাব্যকলা আবিষ্কৃত হবার বহু যুগ পূর্ব্ব হ'তেই প্রকৃতির বক্ষে ঝড়বৃষ্টি, আলো-আঁধার প্রভৃতি খেলা চলচে। শিল্পীরা চিত্রপটে এবং কবিরা তাঁদের কাব্যে সেগুলিকে সকলের সামনে বিশেষ একটি সৌন্দর্য্যে রূপ দিয়ে ধরেচেন, তাই আজ প্রকৃতির সেই সব লীলারহস্য আমাদের কাছে এত মধুর হয়ে প্রতিভাত হচ্চে— জীবন মধুময় করে তুলচে।

চিত্রশিল্পের দুটি দিক আছে। একটি তার অন্তরের ও অপরটি তার বাহিরের দিক। চিত্রের অন্তর হ'ল তার ভাব; আর বাহিরটা হ'ল তার আকার ও বর্ণ বা প্রকৃতি। বর্ণব্যঞ্জনায় ও বাহ্য আকারে চিত্রের ভাব প্রকাশ অনেকটা নির্ভর করলেও ভাবুক শিল্পীর ভাবের বিকাশ বাহ্য আকারের সৌষ্ঠবকে বাদ দিয়েও কখন কখন সম্পূর্ণ হয়—যদিও শিল্পকলায় এরূপ নিদর্শন খুব কমই দেখা যায়। চিত্রের বিষয় বাহিরের যেখান থেকেই শিল্পী গ্রহণ করুন না কেন সেটাকে প্রাণময় করে তুলতে পারার ক্ষমতা না থাকলে সবই বৃথা হয়ে পড়ে। ভাব জিনিষটা মানসিক ভাবনাসম্ভূত, এটিকে বাহিরের পূর্ণ অঙ্গে প্রকাশ করার ক্ষমতা চিত্রশিল্পীর না থাকলে চিত্র আঁকাই হ'তে পারে না। সাধারণত প্রায় সকল লোকেরই কোনো-না-কোনো জিনিষ দেখে আনন্দের উদয় হ'তে পারে। কিন্তু সেটিকে কণায় কণায় সকলের জন্যে বিতরণ করতে পারেন একমাত্র কবি ও শিল্পী তাঁদের কাব্যে ও কলায়।

চিত্রের বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নিয়ম জারি করা চলে না। কোনো শিল্পী খেয়াল-খুশি মত অনায়াসে এমন আশ্চর্য্য রচনা করেন যা অপর শিল্পীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে কল্পনায় আনতে। আবার এমন দেখা যায় যে একটি অতি সাধারণ ছবির বিষয় যা অবলম্বন করে বহুপূর্ব্বে বহুবার শিল্পীরা অনেক ছবি এঁকে গেছেন সেটিকে হঠাৎ কোনো শিল্পী একটি নূতন রূপ দিয়ে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্পদ করে তুল্‌লেন। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা আঁকার পূর্ব্বে বহু আর্টিষ্ট ম্যাডোনা এঁকে ছিলেন কিন্তু র‍্যাফেলের ম্যাডোনার মধ্যে যে ভাব ও বৈশিষ্ট ফুটেচে সেটির জন্যই সেই চিত্র আজ জগতে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতে পেরেচে। ধ্যানী বুদ্ধের অসংখ্য মূর্ত্তি সারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়ানো আছে। কিন্তু সারনাথের প্রশান্তভাবমণ্ডিত মূর্ত্তি এবং সিংহলের অনুরাধাপুরের মূর্ত্তির নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মত বিশেষ ভাবটি অন্য কোনো বুদ্ধমূর্ত্তিতে তেমন ফোটেনি। ম্যাডোনার ছবি ইটালীতে র‍্যাফেলের হাতে পড়ে যা এত উচ্চ স্থান অধিকার করেচে তা যে আবার কোনো আধুনিক শিল্পীর হাতে উৎকৃষ্টতর হয়ে উঠবে না তা' কেহই বলতে পারে না।

দেশকাল ভেদে চিত্রের বিষয় (subject matter) বদলায়। যেমন প্রাচীন যুগে প্রায় অধিকাংশ দেশেই পৌরাণিক (Epic) চিত্র আঁকতে দেখা যায় তেমনি আধুনিক যুগে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে অবলম্বন করে ছবি আঁকার রেওয়াজ বেশি দেখা যায়। কিন্তু যেখানে খুব একটা বড় ভাবকে দানা বাঁধতে হয় অল্পের মধ্যে সেখানে দেশীয় আগম (tradition) বা রূপক (symbol) না মানলে চলে না। তখন অনেক সময়ই পৌরাণিক গাথার শরণাপন্ন হ'তে হয়। আমাদের দেশের লোকের মনে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদনের সঙ্গে যে ভাব ফোটে রামচন্দ্রের পাদুকা বহনে ভরতের যে ভ্রাতৃভক্তি ফুটে ওঠে এবং

সীতাদেবীর অরণ্যবাসে যে ত্যাগের ছবি ও পতিভক্তি প্রতিভাত হয় এগুলিকে বাদ দিয়ে আমাদের দেশের শিল্পীরা ঠিক এইসব ভাবগুলিকে সহজে ফোটাতে পারেন না। এগুলি দেশের ভাবভাণ্ডারের গচ্ছিত ধনের মত এবং দেশের শিল্পীদের আহরণের বস্তু। এক পদ্মের নক্সার সাহায্যে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলায় যে কত ভাবের বন্যা এসেচে তা' দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। এমন কি ভারতবর্ষ বোঝাতে হ'লে পদ্ম এঁকেই ভারতবর্ষকে বোঝানো হ'ত প্রাচীন কালে।

চিত্রের আঁকার বিষয় কখনো পুরাতন হ'তে পারে না। নূতন ক'রে ভাববার ক্ষমতা যাঁর আছে তিনি সব জিনিষেই নূতনকে দেখতে পান। গাছপালা জীবজন্তু বা আমরা আশেপাশে সর্ব্বদা 'যা' দেখচি সেগুলি যদি আমাদের কাছে সত্যই পুরাতন হয়ে যেতো তো আমাদের জীবনের রস শুকিয়ে যেতো এবং রচনা করার কিছুই থাকত না। সাধারণের চোখে যেটি পুরোনো হয়ে যায় শিল্পী সেই বহু পুরাতন নদ-নদী গাছ-পালা পশু পক্ষী স্থাবর-জঙ্গম থেকেই নতুন সুরে নতুন রঙের এবং নতুন ভাবরসের আভাস পান, তাই দিন দিন নতুন নতুন শিল্প রচনা সম্ভব হয়। নচেৎ সবই এক যায়গায় এসে থেমে যেতো। নতুনের রস পান বলেই বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সন্ধান জানতে পারেন প্রতিনিয়তই শিল্পীরা, কেন না তাঁদের কাজই হ'ল চিরপুরাতনের মধ্যে নতুনের অনুসন্ধান করা। প্রতিদিনের রচনা প্রতিদিনই নতুন কিছু দেয়, সেই জন্যেই চিত্রের আঁকবার বিষয় আহরণের জন্য বিশেষ কোনো বাঁধা পথ নেই। মৌমাছিরা যেমন আনন্দে ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ ক'রে ফেরে, শিল্পীরাও তেমনি নতুন নতুন রচনায় নতুন নতুন ভাবের রস আহরণ করার চেষ্টা করেন।

শিল্পে সাময়িক প্রভাব

সব দেশে দেখা যায় যে কবিরা কখন কখন তাঁদের দেশের সাময়িক জীবনের চিত্র এঁকে থাকেন; কিন্তু চিত্রকর বা ভাস্কর তাঁর সমকালের জীবনের সঠিক চিত্র প্রায় আঁকেন না। বিশ্ব-বিধাতার সৃষ্টিতে সবই সুন্দর। মানুষের জীবনকেও তিনি সুন্দর করেই গড়েচেন। কিন্তু কালের গতিকে মানুষ ক্রমশ সভ্যতার আলোক পেয়ে তাদের জীবনকে নানা উপায়ে অস্বাভাবিক করে তোলে। গাছপালা পশুপক্ষীর মত প্রকৃতির বক্ষে নগ্ন অবস্থায় বিরাজ করা আদিম কালের মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল। তারপর ক্রমশ পাতাপরা পালক গোঁজা থেকে শুরু করে মানুষ আধুনিক কালে বিচিত্র বেশভুষায় নগ্নতাকে ঢেকে ফেলেচে। সেই আদিম কালের পালক গোঁজার প্রথা ইউরোপীয় মহিলাদের টুপিতে এবং আমাদের দেশের আধুনিক রাজাদের বহুমূল্য শিরোপায় বর্ত্তমান। শিল্পীরা চান তাঁদের শিল্পকলায় রূপরেখার সাহায্যে চিরন্তন ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে। তাই দেখি যে শিল্পীরা আধুনিক জীবনের সঠিক ছবি আঁকতে গেলে তাতে অস্বাভাবিক বা অস্থায়ী (অর্থাৎ সেগুলি চিরন্তন নয় এরূপ) বেশভূষা এবং আসবাবপত্রের স্থূলতা দ্বারা শিল্পকলাকে কলঙ্কিত করতে চান না। পোষাকপরিচ্ছদ বস্তুতঃ মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যকে বাড়াবার জন্যেই বিশেষভাবে প্রয়োজন; যে পরিচ্ছদে যত শারীরিক গঠন-সৌষ্ঠব ফোটান যায় শিল্পীরা বেছে বেছে সেইরূপ পরিচ্ছদই শিল্প-কলায় স্থান দেন। ইউরোপের ও ভারতের প্রাচীন চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এর যথেষ্ট প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় ভাবচিত্রে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা তাই হালফ্যাসানের

কোটপ্যান্টের ইস্ত্রিকরা ছাঁটের কাপড় পরা নব্যজীবনের চিত্র না এঁকে প্রাচীন রোমীয় টোগা পরিহিত বা একেবারে নগ্নমূর্ত্তিই গড়ে থাকেন। তার কারণ এ নয় যে তাঁরা আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত নন বা পরিচয় ঘটাতে চান না। তার কারণ হচ্ছে যে আধুনিক অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার ভাব দেখাতে গেলে ছবিতে চিরন্তনভাব দেখানো যেতে পারে না। ব্যালজ্যাকের প্রতিমূর্ত্তি যখন রেঁাদা গড়েছিলেন, তখন তিনি ব্যালজ্যাককে dressing-gown এর মত একটা কাপড়ের ভাঁজে জড়িয়ে কোটপ্যান্টের কদর্য্যতাকে ঢেকে গড়েছিলেন এবং ভিক্টরহুগোর প্রতিমূর্ত্তি গড়বার সময়েও তিনি তাতে মানুষের আদিম নগ্নভাবই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রেঁাদা ছাড়া পাশ্চাত্যদেশের সব স্থানেই ভাস্করেরা যে সব নগ্নমূর্ত্তি গড়ে থাকেন তা হয়ত অনেকেই দেখেচেন। সাময়িক পরিচ্ছদের অস্থায়ীত্ব বুঝে এবং তাতে দৈহিক গঠন-সৌষ্ঠব দেখান যায় না বলেই তাঁরা এরূপ নগ্নমূর্ত্তি দিয়ে সেগুলিকে চিরন্তন করেই গড়েচেন। ইউরোপে চিত্রকরেরা বেশীর ভাগ নৈসর্গিক ছবি এঁকে থাকেন। কেন না তাঁরা জানেন যে মানুষের জীবনের চেয়ে এগুলি একইভাবে আবহমানকাল থেকে গেছে। আদিমকালের পাহাড় আর এখনকার কালের পাহাড়, আদিমকালের গাছ আর এখনকার কালের গাছ, আদিমকালের নদী আর এখনকার নদী, আদিমকালের বসন্তশ্রী আর এখনকার বসন্তের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা চিরন্তনধারা রয়েচে, তার বিশেষ কোন তারতম্য হয়নি ;—যে পরিবর্ত্তন বহুকল্পযুগকালে ঘটেচে তার খবর একমাত্র বৈজ্ঞানিকেরাই অবগত আছেন।

ইউরোপীয় শিল্পীরা যেমন আধুনিককালের মনুষ্যজীবনের সঠিক ছবি আঁকা যেতে পারে না বুঝেচেন আমাদের দেশের শিল্পীরাও যদি ঠিক তাই বুঝে থাকেন তো তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। আমাদের দেশের আধুনিক সভ্য-জীবনের চিত্র আঁকতে গেলে

ছবিগুলি এত বেশী উদ্ভট রকমের হয়ে পড়ে যে তাকে ব্যঙ্গচিত্র ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আধুনিককালে বিবাহে টোপর ও বেনারসী শাড়ী ধুতি-চাদরের পরিবর্ত্তে যাত্রার দলের জরি জরোয়ার কিম্ভূতকিমাকার "বরের পোষাক ভাড়া" করে পরাবার রেওয়াজ হয়েচে। এ্যাসেটিলিন গ্যাস জ্বালিয়ে কেবল সহরে কেন ঘোরতর পল্লীতেও বর মোটরগাড়ি চড়ে শুভযাত্রা করচেন। সবদেশে সভাসমিতিতেই মানুষের ভদ্রবেশের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। আমি একবার টাউনহলে সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বাঙালী ভদ্রলোকদের যেরূপ কাপড় পরার রীতি দেখেছিলাম কেউ বুকখোলা বিলাতি ছাঁটের কোটের নিচে ইস্ত্রিকরা শার্টের ল্যাজ ঝুলিয়ে কস্তা পেড়ে কাপড় কুঁচিয়ে পরেচেন, কেউ বা শামলার মত একপ্রকার অদ্ভুত ধরনের পাগড়ী আর ঘাঘরার মত করে কোমরের কাছ থেকে কোঁচকান লম্বা কোট পরে এসেচেন (শুনলুম তিনি নাকি কোন বেদান্তবাগীশ পণ্ডিত), কেউ বা ইংরাজদের ভিতরের পরবার কামিজ পোষাকা হিসাবে পরে তাতে চাদর ঝুলিয়ে বিলাতি পাম্পসূও পরে বেড়াচ্চেন। আমাদের দেশের শিল্পীরা কি এই সব বেশেরই ছবি আঁকবেন? হালফ্যাসানের মেয়েদের জ্যাকেট সেমিজের বাহারও কোনকালে কোন চিত্রকরের কাছেই চিত্রের বিষয় হতে পারে না।

যদি কোন চিত্রকর আধুনিককালের বাঙলার সভ্যতার সঠিক চিত্র আঁকতে যান তাহলে যে কি বিভ্রাট হয় একবার ভেবে দেখুন। যেসব বিলাতি ফ্যাসানের টেবিল-চেয়ার আসবাবপত্র কুৎসিৎ বলে বিলাতি লোকেরা বর্জ্জন করেচে আমাদের দেশের সভ্যসমাজের ঘরে ঘরে সেগুলি বিরাজ করচে। বীণার জায়গায় হারমোনিয়াম, গায়কের স্থানে গ্রামোফোন আসর জমকে বসেচে।

এ-সব ছাড়া বিলাতি ফ্যাসানের চুলছাঁটা, চশমা চোখে দেওয়া, চুরুট মুখে রাখা, বিলাতি ধরনের বাড়ীতে বাস করা প্রভৃতি অনেক ফ্যাসাদ আছে। এগুলির কোনটাও দেশের চিরন্তনভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। অতএব এইগুলিতেই কি শিল্পীরা চিরন্তনের ছাপ দেবেন এবং শিল্পীরা কি এগুলিকেই পাকা করে ভবিষ্যতের জন্যে শিল্পকলায় গেঁথে রেখে যাবেন? এইজন্যেই আধুনিক হলেও আমাদের দেশের আধুনিক যুগের চিত্রকরেরা এগুলিকে স্থান দিতে পারে না। তাই কাল্পনিক জগতে তাঁদের আশ্রয় নিতে হয়।

অবশ্য আধুনিক জীবনের চিত্র শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বঙ্গদেশের থিয়েটারের ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে প্রবন্ধলেখক "বিধবা বধূ ও সধবা শাশুড়ী", "বিষয়াসক্ত," "রুগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন" প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্রে, গগনেন্দ্রনাথের "বিরূপবজ্র" ও "অদ্ভুত লোক" নামক ব্যঙ্গচিত্রের পুস্তক দুটিতে এবং যতীন্দ্র, চঞ্চল, প্রভৃতি নবীন শিল্পীদের আঁকা মাসিক পত্রিকাদির ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে বেশ ফোটান হয়েচে। কিন্তু চিত্রকলার জগতে এগুলির স্থান কতটুকু?

আধুনিক সমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি শিক্ষিত সভ্যসমাজ অপরটি অশিক্ষিত পল্লীসমাজ। এই পল্লীসমাজই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও চিরন্তনভাবে বর্ত্তমান; আধুনিককালে এই সমাজে আবহমান-কাল থেকে যে সব আচার পূজাপদ্ধতি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ একভাবে চলে আসচে তার সম্বন্ধেই ছবি (ডাবা হুঁকোটা বাদে) আঁকা যেতে পারে, এবং সেখানেই চিত্রটি ঠিক আমাদের সাময়িক ছবি না হয়ে চিরন্তন হয়েই ফুটে ওঠে।

আমাদের বাঙলাদেশের চিত্রকরেরা সেইজন্যেই প্রথমত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চিত্র এঁকেচেন। তারপরে আধুনিককালের ছবি এঁকেচেন—কিন্তু সেগুলি আধুনিককালের সভ্যসমাজের ছবি একেবারেই নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অবনীন্দ্রনাথের "ভারতমাতা," "শেষ বোঝা,"

"কলঙ্কের বোঝা" নন্দলাল বসুর "জগাইমাধাই," "কুমারীপূজা" "গোকুলব্রত," "পৌষপার্ব্বন," লেখকের "প্রণাম," "সান্ত্বনা," "নতুন আলো," "নূপুর" সুরেন্দ্রনাথ করের "বৈধব্য," "সাথী" "পথের ধারে," গগনেন্দ্রনাথের পল্লীদৃশ্যাবলী ও "মন্দির দ্বারে প্রতিক্ষা," "বর্ষায় চিৎপুর রোড" প্রভৃতি আরো অনেক ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ছবির প্রকাশ তার বাইরের আকার থেকে। তাই তাকে প্রথমে চোখে দেখতে হয়, তারপর তার ভাব মনের ভিতর সায় দেয়। কিন্তু কাব্যে কবির ভাব চোখ দিয়ে ধরা যায় না। সেটা পাঠের বা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় একটা চিত্র এঁকে দিয়ে থাকে। পাঠক সে চিত্রের সঠিক কোন মূর্ত্তি দিতে পারেন না। এইজন্যেই ছবিতে সে সব বস্তু চোখে পড়বা মাত্রই মনকে পীড়া দেয় এমন জিনিষও কবির বর্ণনাতে পাঠকের মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব এনে দিতে পারে। "চন্দ্রবদন" কথাটি কবির মুখে শুনলে একটি সুন্দর অবর্ণনীয় মুখশ্রীর কথাই আমাদের মনে আনে। কিন্তু ঠিক এই চন্দ্রবদন বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ চাঁদের মত করে মুখ এঁকে কোন শিল্পী যশস্বী হতে পারেন না। "যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল ভরই"—এ ছত্রে কবি প্রেমিকের নীলস্নিগ্ধ চাহনির ইঙ্গিত দিয়েচেন তা তিনি কবি বলেই দিতে পেরেচেন। ছবিতে চোখটাকে নীলোৎপলের নীল রঙ দিয়ে পদ্মাকারে গড়লে কখনই এই ভাবটি ফুটতো না। তখন নীল পদ্মাকারে আঁকা চোখটা "সোনার পাথর বাটির" মত অসম্ভবই ঠেকতো। বাক্যের একটি ইঙ্গিতে কবি যে ভাবটি ফোটাতে পারেন, রেখার টানেতে তা ঠিক সেই ভাবেই যে ফুটে উঠবে এরূপ ভাবা ভুল। কোন কবিকে যদি বর্ণনার দ্বারা কোন ছবি সঠিক ভাবে চোখে ধ'রে দিতে বলা হয় তাহলে ভাষার রণণে ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে তিনি যেমন অসুবিধায় পড়বেন, কোন চিত্রকরকে যদি "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া গো আকুল করিল মোর প্রাণ" ঠিক এই

কথাগুলির ভাবটিকে চিত্রের মধ্যে দেখাতে আদেশ করা হয় তাহলে তিনিও সেইরকম অসুবিধায় পড়বেন। আবার একজন চিত্রকর ইচ্ছাক্রমে কোন নৈসর্গিক চিত্রে আকাশটা সবুজ এবং তৃণলতাকে প্রয়োজন মত কালো আঁকতেও পারেন। কিন্তু কবিকে সেই নৈসর্গিক দৃশ্য বর্ণনার দ্বারা দেখাতে বললে আকাশটাকে আকাশের রঙে ঘাসটাকে ঘাসের বর্ণে না বর্ণনা করলে চলবে না।

যখন কোন আধুনিককালের কবি মাতৃত্বের ছবি কাব্যে ফলিয়ে তোলেন, তখন তিনি মায়েরা জ্যাকেট বা সেমিজ পরে আছেন কিনা বর্ণনা না করেও আধুনিক সভ্যমাতার চিত্র ফলাতে পারেন। কিন্তু এখনকার কালের সভ্যমায়ের চিত্র আঁকতে গেলে চিত্রকরদের ছবিতে হালফ্যাসানের জ্যাকেট বা লেসপেড়ে শাড়ী না আঁকলে চলে না। মায়ের চিত্র মায়ের অবয়ব না এঁকে ছবিতে দেখাতে পারা যায় না। কাজেই আধুনিক সভ্যসমাজের জ্যাকেটপরা মা না এঁকে যেখানে দেশের ভিতর চিরস্থায়ী ভাব রক্ষা করা হয়েচে, সেই অশিক্ষিত পল্লী-সমাজের মাতৃমূর্ত্তিই শিল্পী আঁকবেন—সেটাকে এযুগের মাও বলা যেতে পারবে আবার প্রাচীন যুগের বা ভবিষ্যতেরও বলা চলবে।

শিল্পীর উদ্দেশ্য চিরন্তন সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলা। কাজেই আধুনিক কালের জীবনযাত্রার ভিতর যা অস্থায়ী এবং অসুন্দর তিনি তা বাদ না দিয়ে থাকতে পারেন না। প্রাচীনকালের আঁকা যে সকল ছবি আমরা দেখতে পাই, সেগুলিও ঠিক তখনকার দিনেরই যে সঠিক সামাজিক ছবি তা বলা যায় না। আমরা দেখেচি অজন্তা গিরিগুহার ভিত্তিগাত্রে যে সকল ছবি আছে এবং তার ভিতরে যে ঘরবাড়ীর নক্সা আছে, সেগুলি সেখানকার গিরিগুহার স্থাপত্যের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। তাতে মনে হয় চিত্রে যে স্থাপত্যের ছবি দেওয়া আছে সেগুলি গুহাহর্ম্মের চেয়ে অনেক আগেকার স্থাপত্যের নিদর্শন বা শিল্পীদের কাল্পনিক চিত্র মাত্র। এথেকে আমরা অনুমান করতে

পারি যে অজন্তার চিত্রকরেরাও ঠিক তাঁদের সমসাময়িক জীবনের ছবি আঁকেন নি। সেগুলি আরো প্রাচীন যুগের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে আঁকা বা কাল্পনিক ছবি মাত্র।

সব সময়ে সব দেশে শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যা রচনা করেন তাতে একটা চিরন্তনভাব মূর্ত্তি পায়। এতে যদি তাঁরা কোন ঐতিহাসিকতা রক্ষা করতে যান, তাহলে এক এক সময়ের শিল্পকলা এক একটা উদ্ভট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তাতে কোন রসই থাকে না। সাময়িক ভাব যা ঘটনাকে জীবন্ত করে, তাকে ধরে রাখতে গেলে ছবিটি সেই সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের সহায় হয় বটে কিন্তু তাতে অধ্যাত্মবোধের কোন স্থায়ীভাব না ফোটারই কথা। সেখানে ছবিটি একটা সাময়িক রেকর্ড স্বরূপ হয়ে পড়ে। ফটোগ্রাফী আজকালকার দিনে চিত্রকলার ঐদিকের কাজ সহজেই সুসম্পন্ন করচে।

জাতীয়তা, ধর্ম্ম ও সমাজ নিয়েও শিল্পীদের কেবল বসে থাকলে চলবে না। তাতে খালি একটা সাম্প্রদায়িক শিল্পকলা গঠিত হতে পারে—খুব উঁচুদরের কিছু গড়ে উঠতে পারে না। অজন্তাগুহার প্রাচীন চিত্রাবলিতে যেখানে কেবল কোন বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার, তখনকার কালের ঐতিহাসিক ঘটনা বা জাতকের গল্প আঁকা হয়েচে সেখানে ছবিগুলি তেমন প্রাণস্পর্শী হয়নি। কেননা সেখানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সেই সব কাহিনী বা ধর্ম্মগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত না হলে চিত্রগুলি দর্শককে ততটা প্রীতি দিতে পারে না। আবার যেখানে অজন্তার ছবিতে ঘটনাবাহুল্য-বর্জ্জিত একটি "মা ও ছেলের" ছবি আঁকা আছে, সেখানে সেটি চিরন্তন হয়েই ফুটে আছে। আধুনিক যুগেও যেখানে অশিক্ষিত পল্লীসমাজের ভিতর চিরন্তন সরলতা ফুটে আছে সেইখানেই শিল্পীরা চিরসুন্দরকে দেখতে পান; কিন্তু যেখানে বৈদ্যুতিক আলোক ও সোডাবরফের রেওয়াজ, সেই উচ্চশিক্ষিত সভ্যসমাজে তাঁরা কোনই মাধুর্য্য দেখতে পান না। শিল্পীরা আধুনিক

চাষা, কোল, সাঁওতাল আঁকতে কুণ্ঠিত নন ; কিন্তু আধুনিক সভ্য ধনীর বা গৃহস্থের চিত্র এঁকে তাকে চিরস্থায়ী করতে চান না। প্রত্যেক দেশের চিত্রকলার মধ্যে প্রাদেশিক ভাব সহজেই আপনা থেকেই ফুটে ওঠে ; সেজন্য বিশেষ কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। দেশের বিশেষত্বটি দেশের আবহাওয়ায় এবং অস্থিমজ্জাতেই রয়েচে, তাই তার উৎকর্ষ বাইরের দিক থেকে না করলেও চলে। চিত্রে বিষয় ও ভাব নির্ব্বাচন দেশের চিত্রকরেরাই বুঝে নেবেন, তার জন্যে নতুন কিছু বলবার নেই।

শিল্পে বিভিন্ন স্তর

সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতকলার কোনো মাপকাটি না-থাকলেও তার একটা ক'রে স্তর আমরা দেখতে পাই। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই সকল স্তরগুলি সবই যে টিঁকে থাকে তা নয়, তবে তাদের সন্ধান বেশ পাওয়া যায় শিল্পকলার মধ্যে। টপ্পা, পাঁচালীর যুগে নিধুবাবু এবং এন্টনী সাহেবও ছিলেন আবার এমন অনেকে ছিলেন যাঁদের রস-স্থষ্টি তখনকার কালে জোনাকবাতির মত জ্বলেই নিভে গেছে। তেমনি আবার সাহিত্যে ভারতচন্দ্র তাঁর সময় একই চন্দ্র বিরাজ করচেন, যদিও সে সময় অন্যান্য লেখকের অভাব ছিলনা বঙ্গদেশে। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব সাহিত্যও একটি বিশেষ স্তরের জিনিষ। প্রত্যেক যুগের এই সব স্তরগুলিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে শিল্পকলা সকল স্তরের মানুষকেই আনন্দ যোগায় এবং তার জন্যে বিশেষ স্তরের স্থষ্টি মানুষের সংস্কার ও শিক্ষার স্তর অনুযায়ী হয়ে থাকে।

আধুনিক কালে দেখা যায়, এক স্তরের লোক যাঁরা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া অন্য কোনো লেখকের লেখা কাব্যই পড়তে চান না। আবার এক স্তরের লোক আছেন যাঁরা দেশের নানা প্রচেষ্টার মধ্যে অক্ষমতা প্রকাশ পেলেও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন কেবল নব-উদ্যমগুলি দেখে। আবার একদল আছেন জাতীয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি স্থাপনা ক'রে কলাকৌশলের গৌরব বাড়াতে চান এবং আর একদলের নিকট প্রাচীন যা'-কিছু সবই পিছুদিকে টানে বলে মনে হয়। তারই দলের কতকগুলি আবার কচিছেলেদের প্রচেষ্টার মত শিল্পকলায় হামাগুড়ি দেবার চেষ্টা করতে থাকেন নূতনতর প্রাণ-শক্তির পরিচয় পাবার জন্যে। এই

ভাবে যদি সকল স্তরগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ত হঠাৎ ভাল বা মন্দ বিচার করা শিল্পকলায় চলে না। যেখানে যত সত্যের অনুভূতি জাগে ততটাই আসলে আমাদের কাছে ভাল লাগে। তবে হয় ত আমার যে স্তরের মধ্যে গতিবিধি তা' অন্য স্তরের যোগ্য নাও হ'তে পারে। স্তরগুলি থাকা সম্ভব হয়েছে মানুষের বিভিন্ন বংশগত, সমাজগত আবহাওয়া বা সংস্কারের পার্থক্য ও বিশেষত্বের জন্যে।

আদিম মানুষের আদিম যুগের কাজ এবং তার পরবর্ত্তী সময়ের কাজ থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় মানুষের মনের পরিণতি কি ভাবে চলচে। সকল কলাই সকল মানুষের অধিকারের বস্তু, তাকে স্বতন্ত্র একদল লোকের একচেটিয়া জিনিষ বলে মেনে নিলে চলে না। তবে সাধারণতঃ জনমনের জন্যে যা' গড়ে ওঠে তা' হয়ত এক স্তরের বিশেষ লোকের মনকে স্পন্দিত করতে পারে না। তাই দেখা যায় যে যে-সব সিনেমা-চিত্র শত রজনী ব্যাপী সর্ব্বসাধারণে দেখচে তা' হয়ত আবার কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর লোকের চক্ষে পীড়া দেয়। তাতে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না বা তাঁদের দর্শনের মাপকাঠিটিকে সকলের মাপকাঠিতে পরিণত করবার ব্যর্থ চেষ্টারও কোনো প্রয়োজন নেই।

আদিম যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় রঙ ধরানোর ইচ্ছার ভিতরেই ভবিষ্যৎ সকল শিল্পকলার বীজ নিহিত ছিল; কিন্তু তাই ব'লে এখনো যে সেই বীজেরই পূজা চলবে তা' কেহই বলতে পারে না। এই বীজ সকল কলার আদিম প্রচেষ্টার প্রতীক স্বরূপ। সেই আদিম কালেও দেখা যায় যে তাদের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের উপরে যিনি নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা থাকতেন তাদের বেলায় বেশ একটু তারতম্য দেখা দিয়েছিল গৃহসজ্জা আসবাব প্রভৃতিতে। আদিম অসভ্য সর্দারদের পাথরে তৈরী কুণ্ডলের উপর নানাবিধ

জানোয়ার বা শীকারের ছবি আঁকা হ'ত। তৈজসপত্রগুলিতে বিশেষভাবে কারুকার্য্য-খচিত ক'রে গড়ে তোলা হ'ত অবশ্য সাধারণ লোকদের বেলায় সে-সব কারুকার্য্যের বাহুল্য থাকত না। এইভাবে নানা স্তরের শিল্পসৃষ্টি আদিম কাল থেকেই দেখা যায়। যখন আজকাল ইউরোপের অতি আধুনিক surrealist-দের আঁকা আদিমভাবের হিজিবিজি ছবি দেখি তখন আর চমকে যাই না। কেননা বেশ বুঝি এ থেকে যে জনমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই এগিয়ে থাকনা কেন, সেই আদিম স্বভাব অশনে বসনে জীবন-যাত্রায় থাকবেই থাকবে। তাই তার প্রকাশ ভঙ্গিতে যদি আবার আদিম ভাব স্ফুট হয় ত আমরা তার মধ্যে পাব শিল্প-অবদানের একটি বিশেষ স্তরের পরিচয়।

এইভাবে দেখতে গেলে আমাদের বাংলা সাহিত্যে শতাব্দীর মধ্যে ভারতচন্দ্র থেকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কত স্তরের পরিচয় নিহিত আছে তা' আমরা বুঝতে পারব। এখন আমাদের এতেও মন বসচে না আমরা চলচি ইউরোপীয় অতি-আধুনিক surrealist-দের প্রদর্শিত অভিনব পন্থায় অগ্রসর হ'তে, আমাদের দেশের কৃষ্টি ও সংস্কারকে ছেড়ে—পথ যে কোথায় গিয়ে ঠেক্‌বে তা' কে বলতে পারে? এমন কি রবীন্দ্রনাথও সহসা শেষ বয়েসে বাংলা গদ্যে accentএর ছন্দ না থাকা সত্বেও গল্প-কথিকাগুলিতে পদ্যের ধাঁচে ছেপে প্রচার করলেন, কতকটা যেন চলন্ত নদীর মোহানায় একটা খাল কেটে দিলেন যাতে দেশের ছেলেরা pseudo poetry লেখা ছেড়ে দিয়ে ভালকরে সাজিয়ে শ্রুতি-মধুর গদ্য লিখতে অভ্যাস করেন। এটাকেও একটা বিশেষস্তরে ফেলতে পারা যায়। কেননা এরও একটা প্রচেষ্টা দেশে দেখা দিয়েচে। ছবি আঁকাতেও শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাতের surrealist শিল্পী 'ফুরেনের' পন্থাকে ধরে দিলেন দেশের শিল্পীদের কাছে—এও একটি বিশেষ

স্তরের জিনিষ হ'ল দেশী-বিলাতী প্রচেষ্টায় মিলিয়ে। মন্দ কি ভাল বলবার প্রয়োজন নেই—কেবল চলার কদম গুণে যাই, কোন্ স্তরের কদম কোথায় পড়্চে। ইউরোপের শিল্প-ইতিহাসে দেখা যায় মানুষের মনকে দেশের জন্যে গড়ে তোলার উপায় স্বরূপ শিল্পকলার প্রচেষ্টা একটি বিশেষ স্তরের শিল্প হ'য়ে আছে। আবার রুশের রাষ্ট্রবিপ্লবের পর দেখা গেছে শিল্পকলার লাঞ্ছনা। কিন্তু সেই লাঞ্ছিত শিল্পের মধ্যে বিপ্লবপন্থির ভাবই যে কেবল প্রকট আছে তা' নয়, একদল রাষ্ট্রবিপ্লবী নেতাদের মনস্তত্ত্বও লুক্কায়িত আছে। এই ভাবে শিল্পকলার প্রচেষ্টাকে কেবল দেশ হিসাবে নয়, দেশ, কাল, পাত্র হিসাবেও নানা বিচিত্র স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। অবশ্য এর ভিতর ভাল লাগা বা মন্দ লাগার প্রশ্নই আসতে পারে না। তবে শিল্পকলা জনমনের জন্যে সময় সময় গড়ে উঠ্‌লেও ব্যক্তিগত চেষ্টা সম্ভূত হওয়ায় তার স্তরগুলির নির্দ্দেশ নানা যুগের শিল্পী ও কবিরাই ক'রে থাকেন তাঁদের কার্য্যের দ্বারা। তবে মুক্তপুরুষ তিনিই যিনি রকমারী স্তরগুলি থাকা সত্বেও নিজস্ব কিছু শিল্প ও সাহিত্যে রেখে যেতে পারেন। আমরা তাঁদেরই সাদরে আহ্বান করি।

শিল্পের বিচার

চিত্র শিল্পের বিচার

শিল্প-কলা সম্বন্ধে কোন বিশেষ বাঁধা পথ নেই। এই কারণেই শিল্পকলার বিচারেরও বিশেষ কোন নিয়ম এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এপর্য্যন্ত জগতে যেখানে যত প্রাচীন বা আধুনিক শিল্প-কলা দেখা যায় কোনটিকেই একটা বিশেষ ধারাবাহিক নিয়মের বাঁধুনিতে ধরা যায় না। তাতেই বোঝা যায় যে শিল্পের জীবনাশক্তি এতই প্রবল যে সে কোন একটা বিশেষ রীতিকে অবলম্বন করে বেশী দিন থাকতে চায় না। আমাদের দেশের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে অজন্তার বৌদ্ধ শিল্প এবং মোগল শিল্প এক ভারতবর্ষের দেশীয় চিত্রকরদের দ্বারা আঁকা এবং কতকটা একভাবে আঁকা হলেও যেন আগাগোড়াই বৈমাত্রেয় ভায়ের মত তফাৎ তফাৎ। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই যে ভারতীয় মোগল শিল্পীরা যদি এই প্রাচীনতম দেশীয় শিল্পের সঙ্গে নিজেদের শিল্পের ঐক্য সংস্থাপনের চেষ্টায় কোন শিল্পকলা নতুন করে সৃষ্টি করে রেখে যেতে চাইতেন তবে তা পারতেন না। মোগল শিল্পীরা তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও ভাবের দ্বারা অকপট হৃদয়ে যা এঁকে রেখে গেছেন আজ সেই শিল্প সকল দেশে সকল কালে প্রচারিত ও সাদরে গৃহীত হচ্ছে। তাই বলে এটাও ঠিক যে মোগল শিল্পীরা দেশী শিল্প সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীনও ছিলেন না। তাঁরা পূর্ব্ববর্তন শিল্পের যথেষ্ট কদর যে বুঝতেন তা তাঁদের শিল্পেই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মোগল শিল্পীরা শিল্পের প্রধান জিনিষ 'অনুপ্রাণনা' সেই সকল পূর্ব্ববর্তন ভারতীয় শিল্প থেকে যথেষ্ট লাভ করতেন।

আমাদের দেশের অতি প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পকলা দেখলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে সেগুলি শিল্পীরা খুবই নির্ভীকভাবে সৃষ্টি করে গেছেন—তাঁরা তাঁদের পশ্চাতে শিল্পকলার দর্শকদের সমালোচনার

কথা মনেও স্থান দেননি! কিন্তু মোগল বাদশাহের প্রসাদ লাভ করে বেঁচে থাকতে এবং গুণীদের মজলিসে নিজের গুণপনা প্রকাশ করতে হয়েচে মোগল আমোলের শিল্পীদের। তাই মোগল শিল্পীরাও এবিষয়ে কিছু সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়।

মোগল শিল্পীদের শিল্প মোগল দরবারে তীক্ষ্ণ বিচারে পেশ হয়ে রাজদপ্তরে স্থান পেত। আজও তাই আমরা মোগল চিত্রগুলিকে বহুমূল্য শালের বা সোনারূপার সূক্ষ্ম কাজের মত হিসাব করে দেখে শুনে যাচাই করে ঘরে তুলতে পারি। কিন্তু সকল সমালোচনা ভয়ের অতীত বৌদ্ধ শিল্পীদের খেয়ালের সৃষ্টিতে এই দরবারী ভাবটা মোটেই দেখা যায় না। সেগুলি শিশুর চিত্তের মত সরল ও অকপট বলে যে শিল্পীজনোচিত অনুপ্রেরণা বা পরিকল্পনা শক্তির অভাব ছিল তা নয়, বরং তাদের যত্ন ও সূক্ষ্ম কারুনৈপুণ্যের নিদর্শন দেখা যায়। সকল বিষয় গবেষণা করে দেখলেই স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোন যুগের শিল্পকলাকে অন্য যুগের শিল্পকলার সঙ্গে তুলনা করা বা একটি অপরটির মত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল একথা বলা চলে না।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমঝদারদের মধ্যে কেহ কেহ মোগলচিত্রের সুস্পষ্ট বহুবর্ণের রঞ্জন নৈপুণ্যকে ভারতশিল্পের একমাত্র প্রধান জিনিষ বলে মনে করেন এবং সেই নিয়মে সকল ভারতীয় চিত্র-শিল্পকে বিচার করে থাকেন। পাশ্চাত্যের চক্ষে সূর্য্যালোকিত রঙিন ভারতবর্ষের যা কিছু সবই রঙীন; তাই তাঁরা মোগল চিত্রেও ঠিক তার সায় পান। আবার অজন্তার দিকে যদি দৃষ্টি দেন তো দেখবেন কোন কোন চিত্র নষ্ট-প্রায় হয়ে গেলেও সেখানে এখনও কত রকমের স্পষ্ট অস্পষ্ট বিচিত্র ধরণের বর্ণ-বিন্যাসে আঁকা ছবি আছে। মোগল শিল্পীদের ছবির সঙ্গে সেগুলির তুলনা করলে রঙের জোর প্রকাশ কোন কোন চিত্রে মোটেই নেই বটে, তাই বলে সেগুলির ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প নয় একথা একেবারেই বলা খাটে না।

এখনকার কালে আমাদের দেশে যে জাতীয় শিল্পের অভ্যুত্থান হচ্চে—এই শিল্পের বিষয় যদি আজ আমরা বিচার করতে বসি তাহ'লে এটা জোর করে আমরা বলব যে আমরা মোগল শিল্পীদের প্রদর্শিত পথ ধরে চলব বলে কৃতসংকল্প হয়ে যদি শিল্পপথে যাত্রা সুরু করি তা হলে অচিরেই ভাঙাপথের খানার মধ্যে পড়ে আমাদের বিনষ্ট হতে হবে। এখন যদি আমরা কেহ মনে করি সমস্ত জীবন ধরে মোগল শিল্পীদের মত একখানি সচিত্র পুঁথি বা একখানি ছবি তুলি দিয়ে মক্স করে সম্পূর্ণ করে রেখে যাব,—অথবা ভাবি যে অজন্তা গুহার চিত্রের ন্যায় পাহাড়ের দেয়ালে গুহা তৈরী করে ছবি এঁকে রেখে যাব, তা হলে সেটা কতদূর কিরূপ দাঁড়ায় তা অনুমান করলেই বোঝা যায়।

মোগল আমলের সে সমঝদারও নেই, সে বাদশাও নেই, আর সে আব-হাওয়াও নেই—বৌদ্ধ আমলের সে গুহাবাসের রীতিও নেই আর সে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কিছুই নেই; এখন আছে আমাদের Windsor and Newtonএর রং কর্টিজ পেপার আর আছে বিলিতি তুলি। এখন আমাদের আধুনিক শিল্পের বিচার করতে হলে এই সব নানান দিক বিবেচনা করে তবে বিচার করতে হবে। এখন আমাদের শিল্পের বিচার করতে হলে এই যুগের স্বাভাবিক আসক্তির মধ্যে জাতীয় শিল্পের প্রাণটি বজায় আছে কিনা দেখতে হবে। এখনও যদি কারু হাতে জলপান করলে জাত যাবে বলে জ্ঞাতসারে কোন ডোবার অপরিষ্কার জলকে পবিত্র বোধে পান করি, তা হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; তেমনি শুধু প্রাচীন শিল্প অবলম্বন করে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাতে গেলে বিপদে পড়বার খুবই সম্ভাবনা। যদি মোগল বা অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পের বৃহৎ ছায়ায় আধুনিক শিশু শিল্পের চারাটিকে রোপন করা যায়, তা হলে যেমন অত্যধিক আওতায় মারা পড়বার সম্ভাবনা আছে তেমনি ক্ষুদ্র চারার পক্ষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপও বাঞ্ছনীয় নয়। মোগল ও বৌদ্ধ শিল্পের আওতাও চাই আবার বাইরের রোদ বৃষ্টি ঝড়ও লাগান চাই। তবে

একদিন এই শিল্পকলার বৃক্ষকাণ্ডটি শক্ত ও কায়েমি হয়ে মাথা তুলে উঠতে পারবে।

আজকাল অনেক আধুনিক শিল্পীদের (অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির) চিত্রে জাতীয়তার সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয়তার গন্ধ অর্থাৎ জাপান ও পাশ্চাত্যের আভাস পান বলে কেহ কেহ দুঃখ করে থাকেন। সে তো ভাল কথা। এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তি আছে এবং এখন আর গোময়লিপ্ত গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে আমরা সাত সমুদ্র তের নদীর উন্মুক্ত বাতাসে সচেতন হয়ে উঠেচি এবং তারই খবর যেমন কাব্যে ঘোষণা করচি তেমনি মাঝে মাঝে শিল্পেও গ্রহণ করচি। এখন আর আমাদের বাঙলার আদ্যিকালের পটে আঁকা মহাদেবের মত আর আমরা বসে নেই এখন জাগ্রত হয়ে জগতের সঙ্গে সুখ-দুঃখে যোগ দিতে শিখেচি।

জগতের কোন শিল্পকলা কখনও সাম্প্রদায়িক হ'তে পারে না। এমনি কোন দেশের মধ্যে আবদ্ধও থাকতে পারে না। সত্য যেমন চাপা থাকে না তেমনি বড় শিল্প যে কোন দেশেই জন্মাক সেটির পৃথিবীময় বিস্তার হবেই। এখন আমাদের শিল্পের ভিতরকার কথা যদিও জাতীয়তা কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা এবং স্পষ্ট কথা হচ্চে শিল্পকলা। এই শিল্পকলা শুধু একটা গণ্ডিবদ্ধ শিল্প নয় এটি সমগ্রভাবে আর্ট। খুঁটিনাটি ভাবে রচনার দোষ গুণ সকল শিল্পেই থাকবে সেটা মানুষের সৃষ্টির গুণ; আমরা সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই না; শিল্পকলা ক্ষুদ্রভাবে দেখবার জিনিষও নয়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে শিল্পকলার সমালোচনা শিল্পের সৃষ্টির পূর্ব্বে রাম না হতে রামায়ণের মত হয়ে কোন ফল নেই। আগে শিল্পীদের শিল্প রচনা, তারপরে সমালোচকের সমালোচনা এখন নবীন শিল্পীরা স্বচ্ছন্দে শিল্প রচনা করে যান, এক দিন তাঁরাই সমালোচকের সৃষ্টি করবেন।

জন-মন ও চারুশিল্প

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এখন একটি যুগ-সন্ধিস্থলে উপস্থিত হওয়ায় প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, নেতৃতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্র এইরূপ বাদানুবাদের ভিতর মানুষের মন অনিশ্চিত সংশয়ের মধ্যে ভাসমান হয়ে আছে। এখন তাই শিল্প-কলার মধ্যেও তার আসন কোথায় সেই কথা নিয়ে কৃটিকের দল গবেষণায় লেগে গেছেন। তাঁরা চান মুখ্যতঃ শিল্পকলাকেও পলিটিক্সের আবহাওয়ায় নতুন করে গড়ে তুলতে—বিশেষ গণ-তন্ত্রবাদীদের এখন তাই মত দেখা যাচ্চে। তাই এক্ষেত্রে আমরা শিল্পীরা এ বিষয় কি বুঝি তারই দু-একটি কথা এই নিবন্ধে বলবার ইচ্ছা রইল।

সম্প্রতি 'ঘরোয়া' পুস্তকে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েচেন তাঁদের বাড়ীতে নানান শিল্পকলার উৎসব যে লেগে ছিল তার কারণ ছিল তাঁদের বাড়ীর লোকদের মধ্যে তার 'সখ' ছিল ব'লে। এই 'সখ' যে-শিল্পীর নেই এবং যিনি জনমনের উপযোগী ক'রে কেবল নাম ও পয়সার জন্যে শিল্পকলায় চর্চ্চা করেন, তিনি জন-সমাজের কাছে বাহবা পেতে পারেন বটে, কিন্তু শিল্প-সমঝদারদের নিকট তাঁর কতখানি কদর থাকতে পারে সেই কথাই ভাববার কথা। জনমনের উপযোগী কাজের জন্য রয়েচে ফ্যাক্টারী, আর রসিক-সমাজের জন্যে রচনা করেন শিল্পীরা তাঁদের রচনায় 'সখ' মিটানোর দ্বারা। নতুবা কাব্য জগতে গীতাঞ্জলীর কবিকে ক্রত কথার ছড়া কাটতে হ'ত গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদের জন্যে এবং অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পকলায় ক্যালেণ্ডারের এবং পটের কোঠায় নাবাতে হ'তো। আমাদের শিল্প-শিক্ষাকালে গুরু অবনীন্দ্রনাথ উপমা দিয়ে একবার বলেছিলেন যে কল্‌কাতার গড়ের মাঠের মনুমেণ্টটি দেখে সর্ব্বসাধারণের পুলক সঞ্চার

হচ্চে বলেই সেটি কোনো ভাল স্থাপত্যের নিদর্শন নয়। তাছাড়া (public taste) জনমনরুচি ফ্যাসানের মতই বদলায় এবং তার সঙ্গেও পা ফেলে চলা শিল্পীর কাজ নয়। বিলাতের একজন বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিক তাই বলচেন—"Art should not go to the people—people should come to art" শিল্প জনমনের খোঁজে যাবে না, জনমনই শিল্পের খোঁজ করবে। তাই জনমনের মন-যোগাবার জন্যে শিল্পকলার আবির্ভাব নয়। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এখন যে দেখা যাচ্চে (লোকে খেতে পাক-না-পাক) সিনেমার চলচ্চিত্র দেখবার জন্যে ভিড় জমাচ্চে প্রতিদিন, তার মানে এ নয় যে প্রকৃত শিল্পানুরাগীদের রসের ক্ষুধাও সিনেমায় তারা মেটাচ্চে। অতএব রাষ্ট্রজগতে আধুনিক সোভিয়েট ভাবের ধোঁয়া হঠাৎ দেশের রাষ্ট্রমনে জমে উঠ্‌বে বলে অনুমান করে দেশের আর্টকেও সেই পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে তারই বা মানে কি? রাষ্ট্রক্ষেত্রের এই আন্দোলন সাময়িক আন্দোলন এবং আর্টের স্থান হ'ল চিরকালের সাধনার পরিপক্ক পথে, তাই আর্টকে সাময়িক জনমনের রাষ্ট্রভাবের দোলায় দোদুল্যমান করতে গেলে তার পরিণতি যে কি হয় তা' সহজেই অনুমেয়। জনমনকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাবার বা interpret করার জন্য আর্ট দাঁড়িয়ে নেই—শিল্পীর প্রাণের তাগিদ বা সখই তার আসল কর্ণধার। জনমনের মন যোগাবার জন্যে রাষ্ট্রধর্ম্ম আছে, তাতে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার লাঘব হবার উপায় হ'তে পারে বটে—কিন্তু আর্টের ধর্ম্ম দশের মন ভোলাবার ধর্ম্ম নয়। এমন কি সঙ্গীতকলায় দেখা গেছে বেশী উঁচু কোঠার রাগ-রাগিণী সাধারণ সঙ্গীতজ্ঞেরও বোধের অতীত, তার রস বা দরদ বোঝাবার জন্যে দরদী, বিশেষজ্ঞ ও সমঝদার শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হয়।

যেমন মৃত্তিকায় আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হ'তে পারে না, হীরা নাহলে ও অন্ততঃ একটি কাচখণ্ডের প্রয়োজন (এটি একটি প্রাচীন কথা) তেমনি উচ্চ বিজ্ঞান বা শিল্পকলা বোঝবার বিষয়েও এই একই

কথা খাটে। শিল্পীদের সমস্যা যা' তা' এই যে সহানুভূতিহীন ও রসবোধশূন্য তথাকথিত আর্টক্রিটিকেরা তাঁদের ভাষায় আলংকারিক গুরুত্ব আরোপ ক'রে অনেক বিষয় চালাবার চেষ্টা করচেন আমাদের দেশে অকারণ। যেমন একদল এখনকার শিল্প-রসিক বলতে আরম্ভ করলেন যে প্রাদেশিকতা রক্ষা করে আর্টের চর্চ্চা করতে হ'বে Provincial Autonnomyর মত আর্টেরও ভাগ বাঁটোয়ারার দ্বারা। তাঁরা আর্টকে পলিটিক্সের বাহন করতে চান। অর্থাৎ বাঙালী শিল্পী তাঁদের প্রাচীন ও প্রচলিত পট-চিত্রগুলির নকলে ছবি আঁকবেন, রাজপুতনার লোকে প্রাচীন রাজপুত কলমে এবং মুসলিম শিল্পীরা মোগল রীতিতে ছবি আঁকবেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তেমনি আবার জনমনের খোরাক বা interpret যদি দেশের শিল্পের দ্বারা কোন আর্টক্রিটিক করাতে চান তো ভাস্কর্য্য-কলার স্থলে মেল'র পুতুল এবং দেশী চিত্রকলার স্থলে জনমনের মানসী ক্যালেণ্ডারের ছবিই দেশে আমদানী করবেন। "আর্টকে সস্তা করতে হ'বে" ইত্যাদি কথাগুলির মত ধোঁয়াটে কথা জগতে বিরল। যে শিল্পীর শিল্পকলায় 'সথ' আছে সে কখনই জনমনকে ভেবে নিজের কাজকে খাটো করতে পারবেন না তদনুরূপ ভাবে। তিনি তাঁর standard কে—আদর্শকে যথাসাধ্য উর্দ্ধে রাখবার চেষ্টা করবেন এবং জনমন তাঁর কাজ থেকে হয়ত অনেক দূরেও স'রে যেতে পারে। অবশ্য সাধারণের বুঝতে না পারাটাই তাই ব'লে আর্টের প্রতীক নয়; কিন্তু আর্টকে সস্তা করাটা যে আর্টের সার্থকতা নয় সেই কথাই বলা হচ্চে এক্ষেত্রে।

একদল পণ্ডিতেরা বলেন যে শিল্পকলাটা হ'ল একটা (Social urge) সামাজিক চাহিদা। তারা আর্টকে Art of living অর্থাৎ সামাজিক চলাফেরা, ঘরকন্নার উপাচারের মধ্যে না দেখতে পেলে হাঁপিয়ে ওঠেন। তাঁদের প্রতিপক্ষে বলবার এই আছে যে সৌন্দর্য্যবোধ কারুর একচেটিয়া বস্তু নয়—তা' সর্ব্বসাধারণের জিনিষ। কিন্তু

সেকথা কতদূর সত্য এখন তাই দেখা দরকার। কারুশিল্পের বা ব্যবহারিক শিল্পের বিষয়ে কতকটা অবশ্য সে কথা খাটে; এ বিষয় পরে বলা হবে। কিন্তু চারুশিল্পের (Fine art) স্থান হ'ল অন্য স্তরে। সেখানে শিল্পী রচনায় মধ্যে ডুবে যান রচনাকালে তাঁর মনে থাকে না যে তাঁর বাইরে দর্শকবৃন্দ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে নিন্দা বা স্তুতির পসরা নিয়ে। শিল্পীর intuition—অনুপ্রাণনাই প্রধান। জনমনকে সেখানে শিল্পকলার ভিতরকার রসের মধ্যে ডুবতে হ'বে—তাকে বুঝতে হ'লে। আর সেই শিক্ষার ভিতর যে একটি প্রণালী আছে তার আয়ত্ব করার জন্যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। আমরা জানি, যে আমরা ক'জন যখন প্রথমে দেশের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে শিক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে দেশী ধরণের ছবি আঁকতে আরম্ভ করি তখন আমাদের সমসাময়িক শিল্পী ভ্রাতারা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিলেন আমাদের কাজ দেখে। পরে দেখা গেল ধীরে ধীরে প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনীতে আমাদের কাজ দেখতে দেখতে তাঁদের মতের পরিবর্ত্তন ঘটল; এমন কি তাঁদের মধ্যে গোঁড়া বিদেশী শিল্পের ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দলভুক্ত হয়ে দেশী পন্থায় ছবি আঁকতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে জনমনের সঙ্গে শিল্পীর মনের যোগাযোগ ঘটানোর দরকার আছে কিনা এ নিয়ে শিল্পীদের মাথা ঘামাবার কোনোই প্রয়োজন নেই।

শিল্পীর ভাষাই হ'ল তার কলাকুশলতা আর কৃটিকের কলাই হ'ল তাঁর ভাষা-বিন্যাসের ভঙ্গী। অতএব মুখ্যতঃ কৃটিকের সামনে কোনো শিল্পকলা কেবল শিল্পকলা হিসাবে অর্থাৎ Art for art নয়, তাঁর সেটিকে দেখবার পদ্ধতিতে যে একটি ভাষা-বিন্যাসের ঢঙ আছে সেইটিই হ'ল তাঁর আর্ট। তাই শিল্পীরা কৃটিকের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারেন না,—তাঁরা চলেন মনের তাগিদের ঝোঁককে মেনে নিয়ে। ভারতীয় শিল্পে কোনো কোনো কৃটিক দেখতে পান তার নিছক মৌলিকতা

(Originality) এবং তার মধ্যে যতই অতিরঞ্জন ভাব থাকুক না কেন তার যে রস অনুভব করেন তাই তাঁর কলাকুশল ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন। আবার কোনো কোনো কৃটিক দেখেন তার নিছক রূপক (symbolism) ভাব এবং সেই ভাবগুলিকে দেখাবার জন্যে লেখনীকেও সেইভাবে নিযুক্ত করেন। শিল্পীর কিন্তু অবসর নেই সেদিকে তাকিয়ে দেখবার। তার প্রাণের সখ মিটিয়ে চলেচেন যেন ছবি এঁকে, মূর্ত্তি গড়ে, তা' তাতে সৌখীন লোকের মন বা জনমনের মনকে টলাতে পারুক আর না পারুক।

'কুটোকে অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনা' করা চলে। পাগল বা শিশুদের হিজিবিজি আঁকাজোকার মধ্যেও অপরিণত মনের মনোস্তত্বের সন্ধানলাভ ক'রেও কৃটিকেরা তাঁদের সমালোচনার কাব্যকে অমূল্য সম্পদে ভূষিত ক'রে তুলতে পারেন। কেননা মানুষের মনের নানান ভাব-রস কোনো এক জাতীয় শিল্পীর একচেটিয়া সামগ্রী নয়। তাই পণ্ডিত-কৃটিকেরা অনায়াসে শিশুদের আঁকা হিজিবিজি ছবির মধ্যেও অপরিণত (uncultured) জনমনের আবেদন পেতে পারেন—কিন্তু অন্য কেহই তা' আবিষ্কার করতে পারেনা। সাধারণের কাছে শিশুদের হিজিবিজি ছবিগুলি পাগলের প্রলাপের মতই বোধ হয়। যাঁরা বিলাতের অভিনব Surrealist School এর চিত্রকলার বিষয় জানেন তাঁরা এবিষয় সহজেই বুঝতে পারবেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শিক্ষাবিভাগের যেমন একটি ক্রমপরিণতি লক্ষিত হয়, তেমনি শিল্পকলাকে (অর্থাৎ শিল্পীদের কাজকে) বোঝবার জন্যও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং জনসাধারণকে সেই শিক্ষার উপযোগী করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাঁদের সামনে শিল্প প্রদর্শনী খোলা এবং বাছাইকরা শিল্পকলার সস্তা ছাপার প্রচলন করা বাজারে। তবে সে কাজ শিল্পীর কাজ নয়, তার ভার সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই কারু-না-কারু নেওয়া দরকার। শিল্পীরা বিশেষ করে কৃটিকের দিকে,

ব্যবসাদারীর দিকে, সাহিত্য-রসিক, কলেজের অধ্যাপকদের দিকে বা আভিজাত্য সম্প্রদায়ের দিকে তাকিয়ে বসে নেই। যে শিল্পীর লক্ষ্য সেইদিকে তিনি শিল্পকলা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট পলিটিসিয়ান ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি পেতে পারেন বটে সহজেই জনসাধারণের করতালি কিন্তু শিল্পীর সুনাম থেকে তিনি বঞ্চিত হন। শিল্পীরা নিবাতনিষ্কম্প দীপ-শিখার মত অটল ধ্যানে যেখানে কলালক্ষ্মীর দেউলে সাধনায় রত আছেন, সেখান থেকে তাঁর আসন যায় দূরে সরে। শিল্পী জনমনের প্রসাদ লোভ সম্বরণ ক'রে যতক্ষণ না নিজের মনের মধ্যে প্রবেশ করেন ততক্ষণ—তাঁর শিল্পকলার সাধনা সফল হয় না।

ব্যবহারিক শিল্পকলার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে জনমনের মন-হরণার্থে কাপড়ের পাড় বা ছিট প্রভৃতিতে অভিনবত্ব আনতে গিয়ে কাশীর প্রসিদ্ধ কিংখাপের কাজ বা রেশমী শাড়ী প্রভৃতির নক্সায় যে রুচি পরিবর্ত্তনের ব্যভিচার দেখা গেছে তারও কারণ ঐ একই। আজ ফোর্ড কম্পানীর মোটরকারের অভিনব রূপ দেওয়ার ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ যদি সর্ব্বসাধারণের ভোটের সাপেক্ষ হ'তেন ত হয়ত এমন নিখুঁত নূতন রূপ দিতে পারতেন না। তাঁরা তাঁদের শিল্পীদের হাতে মোটরের ডিজাইনের ভারটি দেওয়ায় এখন সর্ব্বসাধারণ সেটিকে অনুমোদন করতে বাধ্য হচ্চেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটতে বাধ্য হচ্চে। তাই শিল্পীরাই শ্রী বা ছিরি ছাঁদের প্রবর্ত্তক হয়ে থাকেন, জনমনকে তাঁরাই তৈরী করবেন কিন্তু জনমনের মতন ক'রে তাঁদের কলাকে চালনা করলে চলবে না। ফার্সি কবির কাব্যে আছে—

কুনদ্ হামজিন্স্ বা হামজিন্স্ পারওয়াজ।
কবুতর্ বা কবুতর্ বাজ বা বাজ॥

অর্থাৎ একদরের জিনিষ সেই দরের লোকই বুঝতে পারে। যেমন কবুতর কবুতরের দলে এবং বাজপাখী বাজপাখীর দলেই থাকে।

ক্রিটিক ও শিল্পী

দেখা গেছে শিল্প ও শিল্পীদের কদর দেশে তখনই হয়েছে যখন একদল রসগ্রাহী রসিকের আবির্ভাব হয়েছে। অজন্তার চিত্রকলা কতকাল গুহাভ্যন্তরালে লুকানো ছিল তার ইয়ত্তা নেই; Havell, কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে তার কেবলমাত্র দেশে নয় দেশ-বিদেশে আজ কদর হয়েছে। আমাদের মনে আছে যখন ১৯০৯ সালে অজন্তাগুহার চিত্রাবলী নকল করতে যাই তখন শিক্ষিত মহলের খুব কম লোকই তার অস্তিত্বের সন্ধান জানতেন। এই লেখকই তখন প্রথম প্রত্যক্ষ দর্শনের পর 'ভারতী' পত্রিকায় বাঙলাভাষায় তার বিষয় লিখেছিলেন তা' বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে। তেমনি দেখা গেছে বিলাতে শিল্পরসিক Walter Peter ও Ruskin জন্মানোর দরুণই ইউরোপের শিল্পকলা আজ দেশ-বিদেশে আদৃত হচ্চে। নতুবা Whitslerএর ঘোলাটে ছবি, Rodinএর অসম্পূর্ণভাবে গড়া মূর্ত্তিগুলি আজও তাঁদের Studioতেই পচ্‌তো—কেউই জানতে পারত না তাদের ধর্ম্ম কি। এখনকার অনেক শিল্পী যে ইউরোপে দরিদ্রতার হাত থেকে বেঁচে গেছেন এবং বড় বড় সম্মানের অধিকারী হয়েছেন তার কারণও ঐ ক্রিটিকেরা, যাঁরা দেশের লোকের কাছে দেশের শিল্পকলাকে কদর করতে শিখিয়েছেন। প্রত্যেক শিক্ষিত লোক তাই সেদেশে শিল্পী ও শিল্পকে সম্মান দিয়ে থাকেন। দেখা যায় ইউরোপে রাষ্ট্রাধিপতিরা রাজনৈতিক মনোভাব নিয়েও শিল্পকলাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করেন না। তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প-বিত্তালয়ের সেদেশে এত ছড়াছড়ি দেখা যায়। যেদেশে শিল্পীরা দেশের লোকের নিকট যশ, মান, ধন লাভ করে সেদেশ ধন্য হয়, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ক্রিটিকেরা তাঁদের অবলম্বনে রস-রচনা পরিবেশণ ক'রে

ধন্য হন। তারই ফলে দেখা যায় ইউরোপে শিল্পানুরাগ এত যে, প্রায় অলিতে-গলিতে art galleryর ছড়াছড়ি এবং তাতে প্রতিদিন দর্শকের হয় কি ভীড়। সেদেশে শিল্পকলাকে যুগ যুগ ধরে রক্ষা করার নানা উপায় বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা করেন এবং সংস্কার ও সংরক্ষণের (Restoration and conservationএর) জন্যে লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। যেদেশে সত্যিকারের (Serious) ক্রিটিক জন্মালো না সেদেশে শিল্পকলার আদর হবে কি করে ?

শিল্পীদের ধর্ম্ম মনের আনন্দের স্থায়ী অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে রাখা শিল্পকলার ভিতরে ; তার কাজ নয় নিজের কাজের প্রচারের জন্য (Propagandaর) ডঙ্কা বাজানো। আমাদের জীবনে তাই দেখলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও দেশের লোকের চেনার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁর বিদেশ থেকে Noble Prize পাওয়া পর্য্যন্ত। কেননা তিনি নিজের কাজের প্রচারক হতে পারেন নি নিজের মনের আনন্দে কাজ করে যেতে পেরেছিলেন খালি। কেবল দৈবযোগে তাঁর কার্য্যকলা শেষ বয়েসে বিদেশী রসিকসমাজের হাতে পড়ায় তাঁর নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল—দেশের ক্রিটিক বা রসিকসমাজের দ্বারা তা হয়নি। অনেকে হয়ত জানেন না ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত দেশে কবিগুরুকে জানত এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ১৯১১ সালে Sir William Rothenstein এসেছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথেরই নাম শুনে এদেশে। তখন দেশ-বিদেশে অবনীন্দ্রনাথের দেশী পদ্ধতিতে আঁকা চিত্রকলার বিষয় ছড়িয়ে পড়েছিল কুমারস্বামী ও হ্যাভেলের রচনাবলীর মারফৎ। তাছাড়া বিদেশী শিল্পরসিকসমাজ ভারতীয় শিল্পের প্রচারের জন্য India Society নামক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিলাতে স্থাপনা করেছিলেন। Rothensteinএর অনুরোধে কবি কয়েকটি কবিতা প্রথমে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করেন এবং তাঁকে শোনান। ইংরাজী ১৯১৩ সালে কবি বিলাতে তাঁর অতিথি

হয়ে যান এবং কিভাবে সম্মানিত হন তা সকলেরই জানা আছে। এতে দেখা যাচ্চে কেবল গুণী থাকলে হবে না গুণগ্রাহীরও দরকার আছে। শিল্পীরা বাড়ে উৎসাহে—গাছ যেমন বাড়ে জলসিঞ্চনে, তেমনি। কিন্তু আমাদের দাসমনোভাবযুক্ত দেশে তার উপায় কোথায়? এখানে শিল্পীদের একলা একলাই নিজের কাজের আনন্দের আয়োজন করতে হয় এবং অখ্যাত অজ্ঞাত হয়ে মরে যেতে হয়—তাছাড়া আর উপায় কি?

আমাদের দেশে শিল্পীদের মানুষ হতে হয় অশ্রদ্ধার আওতায়। গোড়াতেই শৈশবে ছবি আঁকতে গেলে ত' বাপমার কাছে তাড়া আছেই। তার উপর বড় হয়ে যদি শিল্পীর যশ লাভও ঘটে ত তৎক্ষণাৎ একজন লোক, বুঝুন আর না বুঝুন তার বিরুদ্ধে নানা প্রকার বিরুদ্ধ মত প্রচার সুরু করে দেবেন। অবশ্য এই কলকারখানার যুগে সত্যের স্থলে প্রচার এবং বিজ্ঞাপনের দ্বারাই জিনিষের কদর হতে পারে। যা'ওবা তথাকথিত কৃটিকের দেখা পাই কচিৎ কখনো মাসিক পত্রিকার পাতায়, তাঁদের মনোবৃত্তির প্রশংসা করা অসম্ভব ;— প্রথমতই দেখি বিলাতি কৃটিকদের গ্রন্থাবলীর তাঁরা কীট এবং তারই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করাই তাঁদের কাজ। তার উপর আবার বিলাতি কৃটিকদের লেখার মধ্যে যে বিচারবোধটি আছে তার সুবিচার তাঁরা করেন না। বুঝতে না পারার দরুণ তাঁরা তার কতকগুলি বুলি সংগ্রহ করেন মাত্র, আর যেখানে সেখানে তার প্রয়োগ ক'রে থাকেন। তাঁরা বোঝেন না যে ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি যে পথ অবলম্বন করে আজ দাঁড়িয়েচে তার ঠিক বিপরীত পথ ছিল বিলাতি শিল্পের। বিলাতি আর্ট, প্রকৃতির ফোটো তোলবার পক্ষপাতী হয়ে ওঠার দরুণই সেদেশে তার বিরুদ্ধবাদীর আবির্ভাব হ'ল এবং পূর্ব্বের কাজকে Romantic দোষে দুষ্ট বলে তাঁরা ত্যাগ করতে চাইলেন, এবং তার ফলে নানাপ্রকারের Experimental art যথা, Dadism

Surrealism Futurist, Impressionist প্রভৃতির আবির্ভাব হল। আমাদের দেশের শিল্পে ভাববার বিষয় (problem) ত তা নয়? আমরা একেবারেই দেশের প্রাচীন শিল্পকলার ভিত্তিতে দাঁড়াবার চেষ্টা করেচি, যে শিল্পকলা প্রকৃতির ফোটোগ্রাফতুষ্ট নয়, বা একেবারেই ছবি। এইরূপ গোড়াতেই ছবি আঁকার ভাবকে পোষণ করে আসায় আমরা যখন প্রাচীন চিত্রপদ্ধতিকে নিলাম তখন বিলাতি আধুনিকেরা যা এখন চাইচেন তাকেই পেলাম, নিজেদের প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে। এই খেইটি হারানোর দরুণ আমরা অনেক সময় বিলাতি আর্টের problem এর সঙ্গে ভুলক্রমে নিজেদের শিল্পকে জড়িয়ে ফেলি। এখন বিলাতে এক ধূয়ো উঠেচে আর্ট কোন কিছু বোঝবার মত আকারকে প্রকাশ (represent) করবে না। অথচ চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্যকে ফলানোর মানেই হ'ল আকার দেওয়া অর্থাৎ represent করা। ব্যাপারটা "সোনার পাথর বাটীর" মত একটা কিছু যার স্পষ্ট ধারণা খুব সম্ভব বিলাতি কৃটিকদের নিজেদের মধ্যেও নেই। একটা শিশুও যদি 'কাগের ছা বগের ছা' আঁকে তাও প্রকাশ (represent) করা ছাড়া আর কি বলা যাবে? "Romanticism" "Naturalism" "Significant form" প্রভৃতি আবছা ভাষার চাতুর্য্যে আমাদের দেশের লোকেরা ভুলে যান দেশের শিল্প গতিকে যেমন এককালে আমাদের শিল্পীরা ভুলেছিলেন "Perspective" "Shade and Light" প্রভৃতির কথায়।

আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে যে কৃটিক হলেই দোষ ধরতে হবে। কৃটিক শব্দের ইংরাজি সঠিক মানে যাই হোক— তাদের ধর্ম্ম হল রসগ্রাহীতা, ভুল ধরা নয়। রসগ্রাহীতা হ'ল সৃজন (constructive) কাজ আর ভুল ধরা হ'ল ধ্বংসের (destructive) কাজ। কৃটিকও গড়ে তুলবেন তাঁর রচনার মধ্যে শিল্পীকে;

তাঁকে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করবেন না তার ভুল কোথায় বার করে। ভুল বার করার অধিকারী শিল্পীর শিক্ষক বা ওস্তাদ তার (technical) কারীগরির ভুল দোষ কোথায় তিনি দেখে দেবেন কিন্তু চিত্রকলার সমষ্টিগত ভাবের মধ্যে কতটা রস পরিবেশিত হয়েচে সে কথা ক্রিটিকেরাই বলবেন এবং শেখাবেন সকলকে। কি ভাবে রসগ্রহণ করতে হয় এ বিষয় আমার একটি ব্যক্তিগত কথা আজো মনে পড়ে। যখন ছেলেবেলায় পূজনীয় রবিদাদা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) মহাশয়ের কাছে থাকতাম তখনকার আঁকা প্রত্যেক ছবিটি দেখেই তিনি আমাকে কত যে উৎসাহিত করতেন তা' বলা যায় না। এখন হয়ত সেই সব অপটু রচনা দেখতেও লজ্জিত বোধ করি। কবিগুরুর সেই রসগ্রাহীতার গুণেই আমি যে জীবনে শিল্পকলায় এগিয়ে যাবার চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করতে পারচি তা বলাই বাহুল্য। ক্রিটিকদের কাজ হ'ল এইরূপ ভাবে শিল্পীকে চেনা এবং তার ভিতরকার যে জাগ্রত বোধশক্তির বিকাশ হয়েচে তারই কথা জানানো সর্ব্বসাধারণকে। সেক্ষেত্রে দেখেচি আমাদের দেশে কয়েকটি ক্রিটিক এমনও দেখা দিয়েচেন যাঁরা শিল্পী হতে গিয়ে হতে না পারায় মনে মনে শিল্পীদের উপর রাগ পোষণ করেন এবং তারই ঝাঁঝ তাঁদের লেখাতে কখনো কখনো ফুটে বেরয়। আবার তাঁদের মধ্যে কাহারো বা দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতা জনিত হোক বা অন্য যে কোন কারণে হোক তথাকথিত গীতিকাব্য ভাবের (Lyrical) বা সূক্ষ্ম ভাবযুক্ত ছবি দেখলে সেটাকে সাময়িক উত্তেজনার ফলস্বরূপ বোধ ক'রে উপেক্ষা করেন। সূক্ষ্ম রসবোধের সঞ্চার না হ'লে Lyric কাব্য যে বোঝা যায় না তা সকলেই জানেন যদিও ছবিকে Lyric বা Epic বলার বিশেষ কোনই মানে হয় না। এটা একটা কবিত্বব্যঞ্জক নাম দেওয়া মাত্র সূক্ষ্ম রসাত্মক ছবির আর মোটা ভাবে আঁকা ছবির। সূক্ষ্ম রসানুভূতি জাগানোই (refinements) বল Lyric-এর ভাব

এবং আর্টে তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনই কারণ নেই। এ বিষয় মনে পড়ে দেশের কোন বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কতগুলি কেবল অস্থায়ী সাময়িক ভাবে "চুটকি" Lyric রচনা করে গেলেন Epic মহাকাব্য রচনা করলেন না বলে দুঃখ করেছিলেন। তার উত্তরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

"এই চট্ করে যাহা ব'লে ফেলা যায়
চুটকি তাহারে কয়,
ওগো ছোট লেখা যত লেখে ছোটলোকে
জানিবে সুনিশ্চয়।
দেখ হাফেজ কেবল চুটকি লিখিল
ফেজ খোয়াইল তাই
আর রবি, শেলী, রুমি, বার্ণাস, হাইন
পড়ে সে ক'জন ভাই ?
হোথা শ্লোক তিনটন লিখি মিলটন
অমর হইল ভবে
লোকে পড়ে কিনা পড়ে জানেন বিধাতা
হরি হরি বল সবে।"

এইভাবে দেখা গেছে আমাদের তথাকথিত কৃটিকেরা কেউ কেউ ছবি symbolical, mythological, thiosophical বা allegorical না হ'লে বিরক্ত হন। কেহ বা Romantic আর্টের উপর খড়গহস্ত। বিলাতি আর্ট কৃটিকের বই পড়ে romantic ভাবের আমেজ দেশী ছবিতে পেয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেচেন রাগে। এইভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত চাহিদা বা ধুয়ো যা' তাই দিয়েই শিল্পীদের কাজের যাচাই করচেন। তাঁদের আজ পর্য্যন্ত দেখবার চোখ তৈরী হল না প্রত্যেক শিল্পীর বিশেষত্ব যে কি আছে তা দেখার বা দেখাবার। আজন্ম সাধনা ও অধ্যবসায় দ্বারা শিল্পীরা যা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে পাবার

চেষ্টা করেছেন-তার দরদটিকে চেনার চেষ্টা কাহারো দেখি না। এক্ষেত্রে দশের চোখ শিল্পকলা, ভাস্কর্য্যকলা, স্থাপত্যকলা দেখবার জন্যে তৈরী হবে কি করে? তাই মনে হয় অন্নসংস্থান ছাড়া aesthetic-এর দাবীর যে একটি ভাল দিকও আছে সে কথা দেশকে বোঝাবার প্রয়োজন আছে কিনা তাও জানি না। কবি রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা করে গেচেন, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সশিষ্য দেশের শিল্পকলাকে পুনর্জ্জীবিত করবার জন্যে তার চর্চ্চা করে চলেচেন কিন্তু তাঁদের কাজের রস-পরিবেশনের ভার নেবার যোগ্য ব্যক্তি আজও দেখা দিল না আমাদের দেশে। কবি রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপ প্রচার করল এবং তার ফলে দেশ তাঁকে চিনল আর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে ইউরোপ তার পূর্ব্বেই জানল এবং প্রচার করল কিন্তু দেশের লোকের মধ্যে প্রচার করার মত রসিক এখনো আবির্ভূত হল না। এমনি দুর্ভাগ্য দেশের কপাল। আমাদের দেশে দু'একটি ক্রিটিক নামে যাঁরা খ্যাতি অর্জ্জন করেচেন তাঁদের মধ্যেও দেখতে পাই যে ভালমন্দ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সূক্ষ্মভাবে বিচার করার শক্তি পর্য্যন্ত জন্মায়নি কেবল কথা ফেনিয়ে ছাপার কাগজ ভরে ছেপে চলেচেন। তাঁদের রচিত আর্টের বইগুলি এত দামী যে সর্ব্বসাধারণের কাছে পৌছতেই পারে না। তাছাড়া শিল্পীদের আঁকা ছবির যেরূপ বহুল প্রচার ইউরোপে হয় সস্তাদরের ছাপার দ্বারা, তারও আজ পর্য্যন্ত চেষ্টা হয়নি তাঁদের দ্বারা। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সুলভ সংস্করণের ছাপা ছবি আজ পর্য্যন্ত প্রচার করার ব্যবস্থা হল না। তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে শিল্পীদের অভিনন্দন ক'রে দেশের লোককে শিল্পীদের ও শিল্পকে সম্মান দিতে শেখানোও তাঁরা সমীচীন মনে করেন নি এখনোও। দুঃখের বিষয় মৃত্যুকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দেশের লোকের নিকট স্মরণ করিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে সম্মান দেখাতে। সাময়িক উত্তেজনায় লেখা কোনো কোনো শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধে দেখা যায় একটি গুপ্ত অভিসন্ধি নিয়ে

লেখার চেষ্টা—propaganda করার। কোনো শিল্পীকে বাড়াতে হলে তারই মত নামী আর একজন শিল্পীকে অসম্মান দেখানো তাঁরা কার্য্যসিদ্ধির প্রধান উপায় বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত গুণাগুণ বিচার করার শক্তির পরিচয় বিন্দুমাত্র সে শ্রেণীর লেখার মধ্যে পাই না। দেশে যদি সত্যিকারের রসগ্রাহী সমালোচক থাকত তো দেশের লোকের চোখও তৈরী হয়ে উঠত তাঁদের রসরচনার এবং কাব্যকলার মত শিল্পকলাও দেশের মধ্যে আজ স্থান পেত। দেশের শিল্পীকে সম্মান দেওয়ার কথাপ্রসঙ্গে মনে পড়ল সতীর্থ সুহৃদ নন্দলাল বসুকে। যখন এই লেখক শান্তিনিকেতনে প্রথম আহ্বান করে তাঁকে সম্মানিত করেন পূজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় এবং যখন লেখক পুনরায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকেও শান্তিনিকেতনে এনে অভ্যর্থনার আয়োজন করেন তখনো পর্য্যন্ত শিল্পীদের সম্মান দেওয়ার কথা কারুই জানা ছিল না। ভারতী পত্রিকায় এই লেখকই ছেলেবেলায়, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথের বিষয় অপটু হাতে যা লিখেছিলেন তার পূর্ব্বে তাঁর বিষয় বড় একটা কিছু বের হয়নি। কিন্তু তারপর আজ পর্য্যন্ত হাওড়া পুলের নীচে অনেক জলই বয়ে গেছে এবং অনেক কিছু শিল্প বিষয় লেখা কাগজপত্রে বেরিয়েচে কিন্তু দেশের শিল্পবোধের কোনোই পরিবর্ত্তন ঘটেনি কেন সেটা ভাবার সময় হয়নি কি? তা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত শিল্পগুরু অবনীন্দ্র-নাথের জয়ন্তীর কোনো বিরাট আয়োজনই বা দেশের ভাগ্যে ঘটল না কেন? ক্রিটিকের কাজ শিল্পীদের কাজের মধ্যে যদি কোন বিশেষত্ব বা রস থাকে সেইটিকেই সকলের কাছে ভাষার মৌলিকতায় সুচারুভাবে প্রচার করা। তাঁদের শিল্পকলা দেখবার একটা বিশেষ (সংস্কৃতির) culture এর দৃষ্টির পরিচয় তাঁরা দেন। শুধু জনসাধারণ নয় দেশের শিল্পীদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও তাতে অনুপ্রেরণা লাভ করে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কপালে ঘটেচে সেই সনাতন ইংরাজী কথার

মত "Blind·men leading the blinds" তবে আশা করা যায় যে সেদিন শীঘ্রই আসবে যখন "কানা" কৃটিকের স্থলে "চোখওয়ালা" অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টিযুক্ত রসিকের আবির্ভাব হবে এবং তাঁদের রসরচনায় শিল্পীরা ধন্য হবেন এবং তারই সঙ্গে দেশের শিল্পকলার মধ্যে শিল্পীদেরও মর্য্যাদা লাভ ঘটবে। শিল্পকলায় শিল্পীদের মন প্রচ্ছন্ন থাকে এবং এমার্শেনের উক্তিতে "like minded men" এর, সমান ধর্ম্মীদের আবির্ভাব না হলে তার রস পরিবেশন করা ঘটে না। তার জন্যে শত বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাও অসঙ্গত নয়।

শিল্পে ও শিল্পীর জাতবিচার

আমরা শাস্ত্র অনুযায়ী চলি তাই শাস্ত্রের শস্ত্র আমাদের শিল্পকলাকে ও জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ক'রে টুক্‌রো টুক্‌রো করেছিল। পটুয়া যারা তারা শূদ্র, কাঠের কাজ যে করে সূত্রধর, ধাতু দ্বারা যাঁরা বস্তু নির্ম্মাণ করেন তাঁরা হ'লেন লোহার, স্বর্ণকার, কাঁসারি প্রভৃতি, আর মাটি দিয়ে যাঁরা গড়েন তাঁরা কুমার এইরূপ ভাবে।—আমাদের এই জাতিবিচারের ফলে এখনও বিশেষ ক'রে রাজওয়াড়া মুলুকে দেখা যায় যে, শিল্পকলা এক এক জাতির লোকেদের মধ্যেই আবদ্ধ, তার আর গতি-বৃদ্ধি বা প্রসার নেই। এমন কি এক-একটি অমূল্য কারুকলা ভারতবর্ষ থেকে সেই সব জাতির সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেতে বসেচে। এখন তাই আর artisans অর্থাৎ শিল্পী-পরিবারের লোক ছাড়া অন্য কারু শিল্পকলা শেখবার প্রয়োজন নেই একথা বল্‌লে চলে না।

চারুশিল্প বা Fine art কেবলি পটচিত্রে আবদ্ধ নয়। রূপ, রঙ, ঢঙ এই তিন নিয়ে শিল্প। সেটা কাগজের উপরই হোক্, মাটি, লোহা, পিতল, কাঠ যারই উপর তৈরী হোক্। তাই কারু ও চারু শিল্প (crafts and art) চর্চ্চা করতে হ'লে যার যেটি সহজেই আসে তার সেটির চর্চ্চা করতে হবে। শিল্পকলা ভাবকে রূপ দেয়। যা' আমাদের এই জীবনের আনন্দকে আত্ম-সুখের ও আহার-বিহারের অনিত্যতার উপরে যুগে যুগে সবাইকার কাছে পৌঁছে দিতে পারে, সেই হ'ল শিল্পসৃষ্টি।

এই শিল্পসৃষ্টির শক্তি নিয়ে মানুষ জন্মেছে, এখন কোনো একজাতের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখলে চলবে কেন? আমরা এখন "শিল্পী" বলে নিজেদের গৌরব করতে চাই, আমরা কেবল ধনী বণিকের পণ্যভার

তৈরী করবার জন্যে মামুলি ধরণের কারিগর হয়ে এবং জাতিবিচার ক'রে দেশের শিল্পকলার অগৌরব আর বাড়াবো না। আমাদের শিল্পপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-জীবনের উপর শ্রদ্ধা বাড়াবার চেষ্টা করব। খেটে খাওয়াতে আমাদের গৌরব বাড়বে বই কমবে না। চাকুরীর দাসত্বের অসত্য আমাদের আর ঘিরে থাকবে না। নিজেদের দেশের সব কাজে এবং সব জিনিষের ভিতর দেশী-শিল্পের বিশেষ একটি ছাঁদ ও হাত থাকবে—তা' পিতলের উপরই হোক, লোহার উপরেই হোক, আর যে কোনো ধাতুর উপরই হোক।

সরস্বতীর বর যিনিই লাভ করেচেন তিনিই শিল্পী হ'তে পারেন, তা' যে-কোনোই জাতের লোক তিনি হোন্ না কেন। অবশ্য আমাদের দেশে কতকগুলি কারুশিল্প বংশানুক্রমে চলে আসার কারণ এই যে তাতে ক'রে শিল্পী-পরিবারের ছেলে-মেয়ে বুড়ো সকলেই শিল্পীকে সাহায্য করতে পারায় শিল্প-সম্ভার বেশী পরিমাণে তৈরী হতে পারে এবং সস্তায় ভূরি ভূরি বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। অর্থনীতির দিক থেকে এর উপকারিতা থাকলেও এতে শিল্পকলার নব নব উন্মেষ-লাভ এ উপায়ে ঘটে না; বরং একই ধাঁচের জিনিষ বংশানুক্রমে শিল্পীরা তৈরী করে চলেন। এ কতকটা একঘেঁয়ে একসুরের দেহাতি গাওনার মত অসহ্য হ'য়ে ওঠে। যেন অভিনব জিনিষ রচনার ভার তাঁদের পূর্ব্বপুরুষরাই নিয়ে চুকেচেন তার অধিক আর এঁদের কিছুই করবার নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে কচিৎ কখন জিনিষটির পরিকল্পনা ও রূপ একঘেঁয়ে হলেও তার তৈরী করবার কৌশলের তারিফ না ক'রে থাকা যায় না। যেমন মুরাদাবাদি বাসনের উপর কারুকার্য্য, বাঙলা দেশের কালিঘাটের পট প্রভৃতি। আমাদের এখন দেখা দরকার যে কেবল একটির পর একটি পরিকল্পনার নকল আবহমানকাল থেকে শিল্পীরা করবেন, না নূতন নূতন চিন্তার দুয়ার উদ্ঘাটিত করবেন। যদি শিল্পকলাকে আমরা বাজারের পণ্যকলা (commercial art) মাত্র

ক’রে রেখে নিশ্চিন্ত না হই তবে আর জাতিবিচার ক’রে হাত গুটিয়ে থাকলে চলবে না।

অনেকে আবার প্রাচীনকালের প্রথার দোহাই দেন। কিন্তু বহু পুরাকালে শিল্পশিক্ষা সকল শিক্ষারই অন্তর্গত ছিল এবং ব্রাহ্মণবর্গকে বিশেষভাবে সবকলাই শিখতে হ’তো। এর প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়। জাতিবিচার বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী কোনো কালে কখন ভারতবর্ষে হয়েছিল তার কথা বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকরা বলতে পারেন। শিল্পকলায় শিল্পীদের ছুঁই-ছুঁত ছাড়াও মেয়েদের গান শেখানো ও ছবি শেখানোতেও আমাদের মধ্যে অনেকেরই আপত্তি আছে দেখা যায়। অথচ মেয়েদের এই চারু ও কারুশিল্প থেকে বঞ্চিত করে তাদের শুষ্ক সংসারের নিগড়ে বদ্ধ ক’রে দেশের যে আমরা কত ক্ষতি করি তা’ আমাদের বুদ্ধির অগোচর। মাতৃজাতির কল্পনার উন্মেষ শিল্পকলায় না হ’লে সন্তানদের ভিতর সেভাব কখনও সঞ্চারিত হ’তে পারে না। কতকগুলি কারুশিল্প স্ত্রীজাতির বিশেষত্ব; যথা সূচিকার্য্য, বয়ন, চিত্রণ, আলিম্পন ইত্যাদি। বাঙলার মেয়েরা আলপনার মধ্যে তাঁদের কলালক্ষ্মীর পূজা সম্পাদন ক’রে থাকেন। ছুঁচের কাজ পশ্চিম অঞ্চলের মেয়েদের একটি সখের ও সৌখীন কাজ। লেখক লক্ষ্ণৌয়ের চিকণের লেসের সূক্ষ্ম কাজ মেয়েদের হাতের যা’ দেখেচেন সেরূপ কাজ কলের সাহায্যেও করা সম্ভব নয়। একটি লক্ষ্ণৌয়ের ছোট্ট দোপাল্লী টুপিতে এইরূপ কাজ করাতে গেলে ২০০৲ ৩০০৲ টাকা ব্যয় হয়। এখন ক্রমশঃ কলের তৈরী লেসের আমদানী বিদেশ থেকে হওয়ায় এইরূপ কাজ লোপ পেতে বসেচে।

আধুনিক যুগের শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং স্ত্রীশিক্ষার কদর হওয়ায় আশাকরা যায় যে, দেশের মেয়েদের জন্যে শিল্পকলা চর্চ্চার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র হবে এবং তাতে কোনো জাতিবিচার থাকবে না। অতীত ভারতকে আধুনিক ভারতে জীবন্ত করার উপায় ছুঁই ছুঁতে

নয়, তার এই শিকল কেটে দিয়ে তাকে সব বিষয়ে মুক্তি দেওয়ায়। আসল কথা, মানুষের মনে—(সে যে জাতেরই হোক না কেন) যদি সুর ও রং-এর আনন্দ সহসা রূপ পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে তখন আর কিছুরই বাধা থাকে না। ঠিক যেভাবে রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনে সব ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন এও কতকটা সেইরূপ। যার ভিতর সেই বড় শিল্পীর ডাক পৌঁছবে, তাকে তারই কাছে ছুটে যেতেই হবে।

আমাদের দেশের শিল্পের দুর্গতি আর এক বিশেষ কারণে হচ্চে পরস্পর পরস্পরকে না শেখানোর দরুণ। এমন কি নিজের ছেলেকেও কখন কখন উচ্চশ্রেণীর কারিগরেরা ভালকরে নিজের বিদ্যা দান করেন না। এইভাবে ভারতের অনেক আর্ট একেবারে লোপ পেতে বসেচে—তার আর পুনরুদ্ধারের আশা নেই। শিল্পবিদ্যাকে কেবল অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত করায় এই দোষ বিশেষ ভাবে জন্মায়। পরস্পর পরস্পরকে বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারাতে চায় এবং তাঁদের নিজের নিজের কাজের বিশেষত্বটি অপরের কাছে শেখাতে তাই আর চায় না। শুধু শিল্পকলায় কেন, ভারতের ভাল ভাল ওষুধপত্র অনেকের জানা থাকলেও এই একই কারণে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যাচ্চে।

গভর্মেণ্টের হাতে শিল্পকলা শেখানোর ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারিনা যে শিল্পকলার উন্নতির প্রকৃত পথের সন্ধান সরকারী লোকদের লেফাফাদুরস্ত কাজের বাঁধা নিয়মের মধ্যে নেই। বে-সরকারী বে-পরওয়া উদারচেতা সাধারণের মধ্যেই গুণগ্রাহী, রসগ্রাহী ব্যক্তিরা সে পথের সন্ধান পেলে তবেই দেশের শিল্পকলার মঙ্গল। সরকারী শিল্পবিদ্যালয়গুলি প্রকৃত-রূপে শিল্পশিক্ষা দেওয়ার চেয়ে পরীক্ষা নেবার পন্থা, বাঁধানিয়মের শাসনে চালাবার উপায় উদ্ভাবনা এবং সার্টিফিকেটের ধ্বজাপতাকার

ছাপ দিয়ে বিদায় করার সহজ রাস্তাই দেখাতে পারে মাত্র। সরকারী শিল্পী কর্ম্মচারীটি নানান বাঁধা নিয়ম শাসনের অস্ত্রশস্ত্র শাণাইতে ব্যস্ত, শিল্পকলায় ছাত্রদের মন ধরা দিল কিনা—রসগ্রহণ করতে পারল কিনা তা দেখবার তাঁর আর ফুরসুৎই নেই। এইভাবে দেশের শিল্প-শিক্ষার জাতিবিচার উঠে যাচ্চে বটে, কিন্তু জাতিগত কুসংস্কার যে একেবারে যাচ্চে ব'লে ত আমাদের মনে হয় না। বাঙলাদেশে বেসরকারী শিল্পবিদ্যালয় দু-তিনটি আছে। এখন সেগুলির কিরূপ অবস্থা তা আমাদের জানা নেই। সেগুলিকে এখন কোনো ভাল শিল্পীর হাতে ভার দিয়ে ভাল করে গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়েচে। এখনকার কালে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অপেক্ষা শিল্পকলা ও ব্যবসা বাণিজ্যে অগ্রসর হওয়া আর্থিক উন্নতির দিক থেকেও প্রয়োজন নচেৎ আর্টের চর্চ্চাটাও মাড়োয়াড়ীদের নিকট গচ্ছিত বাঙলার ধন-ঐশ্বর্য্যের মতই থেকে যাবে অচল হ'য়ে।
